পথ ও বিপথ

একাঙ্ক নাটক

কাজী আবদুল ওদুদ

· विश्व भारती ·

शान्ति निकेतन

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

২১০, কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীকিশোরীমোহন সাঁতরা
বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ, ২১০, কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা

১ম সংস্করণ—মাঘ, ১৩৪৬

মূল্য—।৶৹

মুদ্রাকর—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন

প্রস্তাবনা

পথ ও বিপথের কথা প্রচারিত হলো।

সাহিত্যিকের কাজ জীবনের অভিজ্ঞতাকে রূপ দেওয়া। তাতে সাহিত্যে বৈচিত্র্যের আনন্দই ফোটে বেশী কেননা জীবন-ব্যাপার বিচিত্র।

কিন্তু এমন যুগ-সন্ধিক্ষণের সম্মুখীন সাহিত্যিকদের হতে হয় যখন অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যের চাইতে কোনো একটি বিশেষ অভিজ্ঞতা তাদের চোখে অপরিসীম মর্যাদা লাভ করে।

ভারতবর্ষের সাহিত্যিকরা তেম্‌নি এক যুগ-সন্ধিক্ষণের সম্মুখীন হয়েছে; এই প্রশ্নে আজ তাদের অন্তরাত্মা মথিত—তাদের দেশের জন্য কোন্‌টি জীবনের পথ কোন্‌টি মৃত্যুর পথ। বাংলা, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, গুজরাটের চাইতে ভারতবর্ষই আজ তাদের সত্যকার স্বদেশ কেননা তাদের একালের জীবনের ধাত্রী হবার যোগ্যতা বিশাল ভারতবর্ষেরই আছে, কোনো প্রদেশের নেই। অবশ্য পাখীর জন্য যেমন নীড় স্বদেশ মানুষের জন্য তাই, তার বেশীও নয় কমও নয়। পাখীর জন্য নীড় যেমন সত্য আকাশ তার চাইতে কম সত্য নয়।

কিন্তু এমন ধরণের প্রশ্ন সাহিত্যিকদের জন্য যথেষ্ট বিপদজনক, কেননা এ সব সহজেই হতে পারে উৎকট, আর তাদের ভীত বা মুগ্ধ করে করতে পারে কোনো বিশেষ আদর্শের প্রচারক। এমন বিপদ বহু সাহিত্যিকের জীবনে ঘটেছে।

এই বিপদ সাহিত্যিকরা কাটিয়ে উঠতে পারে যদি তাদের অন্তরতম সত্যানুভূতি থেকে তারা স্খলিত না হয়। এমন যুগ-সন্ধিক্ষণে

প্রচারক না হয়ে তাদের উপায় নেই, তবে তারা যেন হয় একমাত্র তাদের অনুভূত সত্যের প্রচারক আর কিছুরই নয়। অন্য কথায়, যাকে পূর্ণ সত্য ব'লে তারা অনুভব করেনি তার ছায়াপাতে তাদের বাণীর দীপ্তি যেন ম্লান না হয়। সত্য নিজেই পরম অভয়, পরম আনন্দ।

এই পথ ও বিপথ তত্ত্বের প্রচারক তার জন্মভূমির ভাগ্যদেবতার ভ্রূকুটিপূর্ণ ভয়াল মুখের পানে চাইতে চেষ্টা করেছে। সেই দেবতাকে প্রসন্ন করবার মন্ত্র উচ্চারণ করবার চেষ্টা তার হয়েছে। বলা বাহুল্য মাত্র চেষ্টায়ই তার অধিকার আছে। ভবিতব্য জানেন সেই দেবতা কার কণ্ঠের উচ্চারিত মন্ত্রে প্রসন্ন হবেন।

ঢাকা
জুলাই, ১৯৩৯

পাত্র-পাত্রী

আলি গওহর	...	সাহিত্যিক
সুজিৎ রায়	...	সদ্যমুক্ত রাজবন্দী
ধীরেন্দ্রলাল ভৌমিক	...	সাহিত্যিক ও সাংবাদিক
গোলাম মওলা	...	নবীন সাংবাদিক, এক সময়ে ধীরেন্দ্রলালের সহকারী।
বশীরুদ্দিন	...	ইসলাম প্রচারক
হাসিনা	...	আলি গওহরের পত্নী

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৯	১২	সুজিতের	গওহরের
৪৭	২৫	বঞ্চিত-অন্তঃসারশূন্য	বঞ্চিত—অন্তঃসারশূন্য
৫০	৬	ন্য	জন্য
৫১	২৫	ধার	ধারা
৫৬	১৮	ধর্ম্ম-প্রচারে	ধর্ম্মাচারে
৭৬	২৩	রূপ	রূপে

পথ ও বিপথ

—:০:—

প্রথম দৃশ্য

[আলি গওহরের বসবার ঘর। রাত্রি প্রায় আটটা, বশীরুদ্দিন নিবিষ্টচিত্তে সিগারেট টানছেন।]

বশীরুদ্দিন

জনাব গওহর সাহেব, আপনাকে বোঝা বেশ কঠিন। মাঝে মাঝে মনে হয় আপনার সঙ্গে আমাদের আসলে কোনো অমিল নেই, অমিল যা দেখা যায় তা উপরকার ; কিন্তু পরক্ষণেই দেখি, ঠিক তা নয়। আপনি কি যে চাচ্ছেন ভেবে পাই না। টেররিষ্ট সুজিৎ রায়কে আপনার এমন অভ্যর্থনা জানাবার কি দরকার ছিল হলেনই বা তিনি আপনার বাল্যবন্ধু ! তাঁর মতো বোমা-পিস্তলের দলের ত আপনি নন !

আলি গওহর

অর্থাৎ ভয় পাচ্ছেন যে এমন একটা লোককে ডেকে আদর দেখালে আমারও পুলিসের নেক নজরে পড়া বিচিত্র নয়।

বশীরুদ্দিন

ভয় যে একেবারে নেই তা নয়। কিন্তু ভয়ের কথাটা থাকুক। গোড়ার কথাটাই ভাবুন না কেন—যার সঙ্গে মতের আকাশ-পাতাল তফাৎ তাকে আপনি এত আপন ভাবতে পারেন কি করে ?

আলি গওহর

সুজিতের সঙ্গে আপনার চাক্ষুষ আলাপ নেই। আপনি কাগজে পড়েছেন ওর নামে অভিযোগ। অভিযোগ যে পুরোপুরি মিথ্যা তা আমি বলতে চাই না। তবে পুরোপুরি সন্ত্রাসবাদী সুজিৎ কোনো দিনই ছিল না। ও বলতো—ইংরেজের আমলে দেশের ক্ষতি হয়েছে; লাভ যে কিছু না হয়েছে তা নয় তবে ক্ষতি হয়েছে বেশী—তার প্রতিকার চাই। সেজন্যে ইংরেজকে বোঝাবো, অনুরোধ করবো, ভয় দেখাবো, তারপর প্রয়োজন হলে তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবো প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে যা সম্ভব যখন যা সম্ভব—সইব না দেশের এই অপকার, সইলে আমাদের জীবন-ধারণ ব্যর্থ হবে। দেখ্ছেন, ইংরেজের সঙ্গে শত্রুতা ওর আসল কথা নয়, আসল কথা দেশের উন্নতি—অবাধ উন্নতি। এইখানে আমরা এক-আত্মা।

বশীরুদ্দিন

ভালো কথা। দেশের উন্নতি কে না চায়। আপনি হজরতের সেই হাদিস জানেন—হুব্বুল্ ওতন মিনাল্ ইমান—স্বদেশ-প্রেম ধর্মের অঙ্গ। কিন্তু কোন্ পথে সেই উন্নতি খুঁজ্বো সেটি কি খুব বড় কথা নয়? সেখানে যার সঙ্গে অমিল, তার সঙ্গে এক-আত্মা হওয়া যায় কি করে বুঝি না।

আলি গওহর

বোঝা খুব কঠিন নয় মওলানা সাহেব। জগতে অমিলের কি অন্ত আছে। আপনার ভাইয়ের সঙ্গে আপনার কত বিষয়ে কত রকমের অমিল! অমিলের চাইতে তাই বেশী করে ভাবতে হয় মিলের কথা। সেই মিল যেখানে বড় রকমের সেখানে ছোটখাটো বহু অমিল অনায়াসে উপেক্ষা করে চলা যায়। আমি বলেছি, সুজিৎ আর আমি দুজনেই চাই দেশের অবাধ উন্নতি। অবাধ কথাটা আপনি লক্ষ্য করেননি

হয়ত। মানুষের অবাধ উন্নতি—এইই আমার কাছে মানুষের জ্ঞান ধর্ম্ম কর্ম্ম সব-কিছুর সার।

বশীরুদ্দিন

এই ত আপনাকে বোঝা কঠিন হয়ে উঠ্‌লো। স্বদেশ-প্রেম ভাল জিনিষ, যে জীবন উন্নত তাতে ওটিও চাই—এতটা বুঝতে পারি। কিন্তু ওটিকে সব জ্ঞান-ধর্ম্ম-কর্ম্মের সার জ্ঞান কর্‌ছেন কেমন করে? তাহলে আল্লাহ্ পরকাল এসব ত উড়ে যায়। অথচ আপনার কথা শুনে মাঝে মাঝে মনে হয়, আল্লাহ্ পরকাল এসব যারা মানে না তাদের দলের লোক আপনি নন।

আলি গওহর

আল্লাহ্ আর পরকাল মানি না এ কথা বলবার সাধ্য আমার নেই। কিন্তু আল্লাহ আর পরকাল বলতে আমি কি বুঝি সে-সম্বন্ধে যথেষ্ট কৌতূহল বোধ করবার প্রয়োজন হয়ত আপনার কখনো হয়নি।

বশীরুদ্দিন

এ সম্বন্ধে আপনার মতামত জানতে পেলে খুশী হব।

আলি গওহর

সব কথা সব সময়ে বলাও যায় না শোনাও যায় না। সময় এবং সহানুভূতি দুইই মানুষের জন্য অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

বশীরুদ্দিন

যা সীমাবদ্ধ তাও সময় সময় দেখায় অসীমের মতো। আপনার মতামত জানবার জন্যে আমি কতখানি উদ্‌গ্রীব তা আপনি জানেন না।

আলি গওহর

আপ্যায়িত হলাম আপনার সহৃদয়তায়। বলতে চেষ্টা করা যাক্। যাঁরা ধর্ম্ম মানেন বলেন তাঁরা আল্লাহ বলতে বোঝেন একটি বিশিষ্ট

সত্তা—তা সে-সত্তাকে তাঁরা বিশ্বাতীত, বিশ্বপরিপ্লাবী, বিশ্বপ্রাণ, যাইই বলুন। আমার আল্লাহ্ তেমন একটি সত্তা, না বৈজ্ঞানিক কার্য-কারণ-বোধ, না জগৎ ও জীবনের কল্যাণমুখিতায় বিশ্বাস—ঠিক জানি না। এই তিনটির কোনো একটিকে একান্ত করে' ভাবতে গিয়ে দেখেছি—মনে আনন্দ জাগে না। এমন কি, এই তিনটি ধারণার বৈশিষ্ট্য চিন্তায় সুস্পষ্ট করে' তুল্‌তে গিয়েও দেখেছি, অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়, বলতে চায়—কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে বিকৃত ও ব্যর্থ করা হচ্ছে যা সুসম্পূর্ণ ও জীবন্ত তাকে।

বশীরুদ্দিন

পরকাল সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?

আলি গওহর

পরকাল সম্বন্ধে আর একটু স্পষ্ট ভাষায় কথা বলতে পারি। মৃত্যুর পরে মানুষ কোথায় কি ভাবে থাকবে সে-সম্বন্ধে আমি নিরুত্তর—নিরুত্তর থাকাই সঙ্গত ও শোভন মনে করি। তবে জীবন আমার কাছে এক হিসাবে মৃত্যুহীন। যে কয়েকটি বৎসর বাঁচা গেল দেহের অবসানের পরেও চল্‌লো তার ফলপ্রসব। মৃত্যুর পরেও জীবনের এই যে ফলপ্রসব, এই সংসারক্ষেত্রেই—এই আমার পরকাল। এই পরকালের কথা মনে না রাখলে জীবন অজ্ঞান জীবন হয়, মানুষের জীবন হয় না।

বশীরুদ্দিন

বোঝা গেল সাংসারিক জীবনে কি ভাল কি মন্দ, কি ন্যায় কি অন্যায়, এই দিয়েই আপনি মানুষের জীবনের ভাল মন্দর বিচার করতে চান। সাংসারিক জীবনের ভাল-মন্দ ন্যায়-অন্যায়ের বিচার যে ধর্মে নেই তা নয়, বরং রীতিমতই আছে। কিন্তু সেই সাংসারিক জীবনের ভালোর জন্যেও কি পরকালের চিন্তার দরকার নেই? পরকালের ভয়

আর রাজ-ভয় এই দুই ভয় বাদ দিয়ে কি মানুষের সমাজ-জীবন চলতে পারে?

আলি গওহর

পরকালের চিন্তা ত আমি বাদ দিতে বলিনি।

বশীরুদ্দিন

আমার ভুল হয়েছে। আমি বল্‌তে চাচ্ছিলাম—আমার কাজের দ্বারা আমার নিজের জীবনে কয়েক বৎসরের জন্য সুখ হবে না দুঃখ হবে, কিংবা ভবিষ্যদ্‌-বংশীয়েরা সুখ পাবে না দুঃখ পাবে, তার চাইতে, এই জীবনে অন্যায় করলে আমি মৃত্যুর পরে অশেষ দুঃখ পাব আর ভাল করলে অশেষ সুখ পাব, এই চিন্তাই কি মানুষকে সৎপথে রাখ্‌তে বেশী সক্ষম নয়? রাজশক্তির দ্বারা ব্যক্তিগত জীবনে শাস্তির ভয়ে যেমন মানুষ অনেকখানি সংযত থাকে?

আলি গওহর

রাজশক্তির ভয়ে মানুষ সমাজজীবনে সংযত থাকে মিথ্যা নয়। কিন্তু ওখানে একটু দেখবার আছে। প্রবল বিজয়ীর ভয়ে বিজিতেরা যেমন সংযত থাকে সে রকম সংযম মানুষের জন্য কাম্য নয়। মানুষের জন্য কাম্য সংযম যেন সুনিয়ন্ত্রিত রাজপথের সংযম—কারো গমনাগমনে বাধা নেই, বেগবান্ যানবাহনও চলেছে, অথচ পথ এমন সুনিয়ন্ত্রিত যে বিশৃঙ্খলা হচ্ছে না। পুলিসের হাত উঠানোর উপরেই যে এই শৃঙ্খলা নির্ভর করছে ঠিক তা নয়, বরং পুলিশের হাত উঠানোর সঙ্গে চলেছে সব রকমের যাত্রীর সহযোগিতা। বাধা গতির সহায় হয়েছে এখানে—কূলের বাধা যেমন সহায়তা করে নদীর স্রোতোগতিকে। পরকালের ভয় বল্‌তে আপনি যার ইঙ্গিত করছেন তাতে আমার আপত্তি এই জন্যে যে ওখানে ভয়ই বড় হয়ে উঠেছে—মহৎ প্রেরণার সঙ্গে ওর বৈরী-ভাব।

বশীরুদ্দিন

আপনি অবিচার করছেন। যাঁরা পরকালের ভয় করেন তাঁদের মধ্যে কি মহৎ প্রেরণার একান্ত অভাব? সব মানুষের প্রতি প্রেম, সমস্ত জগতের জন্য কল্যাণ-কামনা, এসব নেই?

আলি গওহর

অবিচার আমার দ্বারা কখনো না হোক এই আমার জীবনের প্রার্থনা। আমি বল্‌তে চাই—পরলোকের ভয় যাঁরা করেন তাঁদের মধ্যে যাঁরা জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে মানব-প্রেমিক তাঁরা মুখ্যতঃ মানব-প্রেমিক, অথবা প্রেমিক, ভয় তাঁদের ভিতরে গৌণ। অথবা, তাঁদের এই ভয়কে ভয়ই বল্‌বো না, ওটি বিধানের প্রতি শ্রদ্ধা—সংযমকে জীবনে বরণ করে নেওয়া।

বশীরুদ্দিন

এই শ্রদ্ধা ত পরের কথা, ভয়ই ত আগে চাই—যেমন চারাগাছের জন্য চাই বেড়া। তাছাড়া একটি কথা আপনি হয়ত কিছু কম ভাবছেন গওহর সাহেব। বিধানকে যাঁরা অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধা করতে পারলেন তাঁরা ত মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তাঁরা ক'জন? ভয়ে যারা অন্যায় থেকে বিরত থাকে, সমাজও রক্ষা পায়, প্রধানত তাদের নিয়েই ত মানুষের সমাজ।

আলি গওহর

সে কথা কে অস্বীকার করবে? কিন্তু চিন্তাশীলদের মোটামুটি দুই দলে ভাগ করে দেখা যেতে পারে:—একদল বিশ্বাস করেন, মানুষ যেমন ছিল তেম্‌নি আছে তেমনি থাকবে, বড় রকমের একটা উন্নতি বা ওলট-পালট আশা করা মূর্খতা, এই দোষে-গুণে-ভরা সংসার ও জীবনের ভার বইতে পারাই যথেষ্ট, সমাজের ব্যবস্থা আর মনের অবস্থা যাতে তার অনুকূল থাকে তাইই কর্ত্তব্য; অপর দল বলতে চান, জগৎ ও জীবন

প্রকৃত প্রস্তাবে ভাল কি মন্দ সেই চরম তত্ত্ব নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার চাইতে অনুভব করা যাক—বাঁচার অর্থই কিছু করা, নিশ্চেষ্ট না থাকা। সেই চেষ্টা সর্ব্বব্যাপী—শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মনের চিন্তা, হৃদয়ের অনুভূতি, সব চলতে চায়, বিকাশ চায়। এই সর্ব্বব্যাপী চলা ও বিকাশের আয়োজন জীবনে যদি না হয় তবে জীবন পঙ্গু হয়, বাঁচার আনন্দ বা জীবনের দীপ্তি তাতে খেলে না। আমি এই বাঁচা ও বিকাশের আনন্দের দলের। আপনি যদি অপর দলের হন তবে আপনার আর আমার মধ্যে বিরোধ বড় রকমের।

বশীরুদ্দিন

আমি যে কোন্ দলের তা চট্ করে বলা আমার পক্ষে কঠিন। আপনার অতখানি উৎসাহ আর আশা আমার নেই তা বুঝি, কিন্তু প্রথম দলের ভিতরে যতখানি অবিশ্বাস ততখানি অবিশ্বাস আমার মধ্যে আছে তা মনে হয় না। আপনি যে দুই দলের নাম করলেন এ ভিন্ন আরো দল থাকা সম্ভব—আমি তারই এক দলের।

আলি গওহর

আরো দল ত আছেই, যেমন শাদা ও লালের মাঝখানে বহু রং আছে। আমি বল্‌তে চাচ্ছিলাম, সেইগুলো সাজালে কোন্‌গুলোর ভিতরে লালের ভাগ বেশী, আর কোন্‌গুলোর ভিতরে শাদার ভাগ বেশী, তা আন্দাজ করা যায়।

বশীরুদ্দিন

আপনি কঠিন প্রশ্ন তুলেছেন গওহর সাহেব—আমি কোন্ দলের—মানুষের উন্নতিতে বিশ্বাসী, না অবিশ্বাসী। আল্লাহ্‌কে মানি, পরকালে বিশ্বাস করি, কাজেই মানুষের উন্নতিতে যারা বিশ্বাসী তাদের দলেই নিজেকে ফেল্‌তে ইচ্ছা করে। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই ত প্রশ্ন জাগে—সে-বিশ্বাসের শক্তি কতখানি! সেটি সত্যই একটি প্রবল বিশ্বাস, না বিশ্বাস

করি ব'লে ধারণা! যাক্ আপনার প্রশ্নটা আমার মনে রইল, আপনার প্রতি শ্রদ্ধাও কিছু বাড়লো। কিন্তু তবু ত আমাদের সেই মূল কথাটাই রয়ে যাচ্ছে। আপনি আস্তিক আর আপনার বন্ধু নাস্তিক—জীবন আর জগৎ দুঃখময় ব'লে তিনি নাস্তিক একথা তিনি প্রকাশ করেছেন। তাঁর সঙ্গে আপনি এক-আত্মা হতে পারেন কি করে তা আমার পক্ষে এখনো দুর্ব্বোধ্য।

আলি গওহর

এখানেও সেই একই কথা—যিনি নিজেকে বলছেন নাস্তিক তিনি আর কি বলছেন। যিনি বলেন—ঈশ্বর নেই, পরকাল নেই, জীবনের কোনো উদ্দেশ্য নেই, যার যা খুশী কর অথবা কিছুই না ক'রে মরে যাও; আর যিনি বলেন—জীবন বহুবিড়ম্বনাময়, জগৎ অত্যাচারে অবিচারে পূর্ণ, অহেতুক ধ্বংসে পূর্ণ, সুতরাং এ সবের একজন সর্ব্বজ্ঞ মঙ্গলময় নিয়ন্তার কথা ভক্তিভাবে ভাবা আত্মবঞ্চনামাত্র, তাতে জীবনকে আরো দুর্ব্বল করে' ফেলা হয়, কিন্তু জীবনকে দুর্ব্বল করলে চল্‌বে না, মানুষকে বাঁচতে হবে, ভাল ভাবেই বাঁচতে হবে, ঈশ্বর না থাকুন কিন্তু মানুষকে বড় হতে হবে—এই দুই নাস্তিককে কি এক দোজখে ফেলবেন?

বশীরুদ্দিন

নূতন করে' আর এঁদের ফেলতে হবে কেন—দোজখে ত এঁরা পড়েই আছেন। উঃ—মানুষের সমস্ত আশা-ভরসা আমোদ-আহ্লাদ এঁদের বিষ-নিশ্বাসে কেমন পুড়ে ছাই হয়ে যায়। শুধু এই জন্যেই ত এঁদের সংস্রব মানুষের ত্যাগ করা উচিত।

আলি গওহর

তা মানুষ এঁদের সংস্রব ত্যাগ করছে কৈ। করছে যে না তার কারণ, আশা-ভরসা মনে স্থান দিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করতে গিয়ে দেখছে—দুঃখকে এড়ানো যায় না। আর এ দুঃখ নানা আকারে জগতে

জম্‌ছে। তাই প্রথম থেকেই দুঃখের দীক্ষা নিয়ে জীবন শুরু করবার দিকে অনেকের খেয়াল যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের আসল কথাটা জট পাকিয়ে গেছে। যে দুই নাস্তিকের কথা বলা হলো তাঁরা সমভাবে দুঃখবাদী নন। একজনের দুঃখ চিরদুঃখ, সুখ-সূর্য্যের উদয় তাতে অসম্ভব। অপরজন সূর্য্যের উদয়ে তেমন বিশ্বাসী নন, কিন্তু প্রদীপ জেলে নিজের কাজ গুটিয়ে নিতে হবে একথা ভালভাবেই মনে স্থান দেন। এঁর জন্য জীবন মহৎসম্ভাবনাময়, সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত আনন্দময়।

বশীরুদ্দিন

হাঁ কিছু বোঝা গেল আপনার নাস্তিক বন্ধুর সঙ্গে কোথায় আপনার মিল। কিন্তু আল্লাহ্‌কেই যে বাদ দিলে সে কি কোনো দিন জীবনের কূল কিনারা পাবে! আল্লাহ্‌র উপরে বিশ্বাস হারালে জীবনে কি এতটুকু স্বাদও বাকি থাকে! আচ্ছা এঁদের মতে আপনি যদি কোনো ত্রুটি না দেখেন তবে আপনি নিজে এঁদের মত গ্রহণ করেন না কেন?

আলি গওহর

এঁদের মতে কোনো ত্রুটি দেখি না এ কথা ত আমি বলিনি। আমি বলেছি, এঁদের চিন্তা-ভাবনার একটি দিক আছে, সেদিক থেকে দেখলে এঁদের কথা কিছু বোঝা যায়, ঠিক মন্দ বলা যায় না—যেমন আম বেদানা নয় ব'লে তাকে মন্দ বলা যায় না।

বশীরুদ্দিন

কিন্তু মানুষে মানুষে কি এতই তফাৎ! যেমন আম আর বেদানায় তফাৎ! তাও আল্লাহ্‌র ধারণার মতো একটি মূল ব্যাপারে! আমার ত মনে হয় আল্লাহ্‌কে যারা মানে না বলে তারা গায়ের জোরে ও কথা বলে—ও তাদের একটা খেয়ালী কথা। আপনি সেদিকটা হয়ত দেখ্‌ছেন না।

আলি গওহর

ওটি খেয়ালী কথা কি না বলতে পারবো না, তবে ও কথার উপরে আমি জোর দিই না। আমি দেখ্‌তে চেষ্টা করি প্রতিদিনের জীবনে কার কি আচরণ। সেখানে যাকে দেখি ভাল, ভালোর দিকে গতি, দশজনের কাজে লাগ্‌তে তার স্বাভাবিক আগ্রহ, তাকেই জানি আমার ভাই ব'লে তা থাক্ না তার সঙ্গে বহু রকমের পার্থক্য—সে সব আসলে ছোট। আল্লাহ্‌কে আমরা কতটুকু ভাবতে পারি মওলানা সাহেব! আপনার হয়ত সহজেই মনে পড়বে কোর্‌আনের সেই 'আয়াত'টি যেখানে বলা হয়েছে—আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে ভুল ধারণার জন্যে মানুষ আল্লাহ্‌র রোষে পতিত হয় না, পতিত হয় দুষ্কৃতির জন্যে।

বশীরুদ্দিন

হাঁ মনে পড়্‌ছে—"ওমা কানা রব্ব্‌কা লেইউহ্‌লেকাল্‌কুরা বে জুল্‌মেঁও্‌ ও আহ্‌লুহা মুস্‌লেহুন"। কিন্তু কোরআনেই কি বেশী করে বলা হয়নি—আল্লাহ্‌কে মানো, তাঁকে সর্ব্বশক্তিমান অদ্বিতীয় ব'লে জানো, তার সম্বন্ধে মিথ্যা ধারণার বশবর্ত্তী হয়ো না? আল্লাহ্‌কে যথার্থভাবে জানতে হবে, আর ভাল কাজ করতে হবে—এই দুয়ের উপরেই কোরআনে জোর দেওয়া হয়েছে।

আলি গওহর

হাঁ তা হয়েছে। তবে আমি কোরআন পড়ে যা বুঝেছি তাতে মনে হয়েছে আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে মানুষ যতখানি ধারণা করতে পারলে তারও উপরে তার ভালো কাজের উপরে জোর কোরআনে বেশী দেওয়া হয়েছে। যে 'আয়াত'টি আপনি আবৃত্তি করলেন তার ইঙ্গিত সেই দিকে।

বশীরুদ্দিন

আপনার এ ব্যাখ্যা নতুন। কোরআন যাঁরা আলোচনা করেন তাঁরা এ-ব্যাখ্যা দেন না।

আলি গওহর

এটা যদি ব্যাখ্যা হয়, ফাঁকি না হয়, তবে হলোই বা নতুন। গাছের নতুন পাতা দেখে কে না খুশী হয়?

বশীরুদ্দিন

আমি বেশ মুশ্‌কিলে পড়েছি গওহর সাহেব। যদি শুধু মওলানা হতাম তবে আপনার সঙ্গে এত কথা বলবার প্রয়োজনই হতো না। সোজা দেখতাম আপনার সঙ্গে আমাদের বড় রকমের অমিল। কোরআন আল্লাহ্‌র বাণী, তা মান্‌তে হবে, যুক্তি তর্ক দিয়ে যদি তা বুঝি তবে ত ভালই, যদি না বুঝি তবু মান্‌তে হবে—এ ব্যাপারে কারো সঙ্গে কোনো রকমের রফা হতে পারবে না। কিন্তু নিজের মনে খোঁজ নিয়ে দেখেছি, কোরআন মান্‌তে হবে এ ধারণা আমার মধ্যে যত প্রবল, যুক্তি-তর্ক বাদ দিলে চল্‌বে না এ ধারণাও তার চাইতে কম প্রবল নয়। জানি না এ আমার এক গোপন দুর্ব্বলতা কি না। তা থাকুক নিজের কথা—আপনি যে বলতে চাচ্ছেন ভাল কাজের উপরেই সব চাইতে বেশী জোর দিতে হবে, একি যথার্থ? আল্লাহ্‌কে না মান্‌লে ভাল কাজ করার জোর কি পাওয়া যায়? শুনেছি অনেক নাস্তিক নাকি আছেন তাঁরা যেমন বিদ্বান্ তেম্‌নি মানুষের উপকারী বন্ধু। তাঁদের চোখে দেখেনি।

আলি গওহর

আমিও যে খুব দেখেছি তা নয়। তবে এঁদের কথা কিছু কিছু জানি। বুদ্ধদেবের কথা ভাবলেও এই ঈশ্বরে অবিশ্বাসী অথবা ঈশ্বর-

সম্বন্ধে নির্বাকদের মনের ভাব কিছু বুঝতে পারবেন। বুদ্ধদেব যে একজন বড়দরের লোক সে সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আপনার সন্দেহ নেই।

বশীরুদ্দিন

বুদ্ধদেবের কথা আমি ভাবিনি। কিইবা ভেবেছি। কিন্তু তাঁর মত ত টিক্‌লো না। তাঁর জন্মভূমি ভারতবর্ষে আজ বৌদ্ধ নেই!

আলি গওহর

ভারতবর্ষে বৌদ্ধ নেই বল্লেই চলে। তবে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী লোক এখনো জগতে ঢের। কিন্তু সম্প্রদায় বড় কি ছোট তাই দেখে কোনো মহাপুরুষের মাহাত্ম্য নিরূপণ করতে যাওয়া আমার কাছে বড় অদ্ভুত লাগে। ধরুন মুসলমান সম্প্রদায়েরই কথা। যেদিন মুসলমানেরা নূতন সভ্যতার বিস্তার করেছিল, জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সন্ধান নিয়েছিল, সেদিন তারা আজকার দিনের চাইতে সংখ্যায় অনেক কম ছিল। কিন্তু শিষ্যের মাহাত্ম্য যদি গুরুর মাহাত্ম্যের পরিচায়ক হয় তবে হজরত মোহম্মদের গৌরব তাঁর সেই যুগের অল্প শিষ্য দিয়ে, না এযুগের বহু শিষ্য দিয়ে?

বশীরুদ্দিন

তা জোয়ার-ভাঁটা উত্থান-পতন এ সব ত আছে। এখন মুসলমানের সংখ্যা যত তাতে সুদিন যদি তাদের আসে তাহলে হজরতের মাহাত্ম্য আগেকার চাইতে বেশী প্রচারিত হবে না কি? যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ এ ত আপনি মানেন।

আলি গওহর

খুব মানি। কিন্তু আশা করছি, না আশার ভান করছি সে কথাও বুঝতে হবে। আশা করার অর্থই হুশিয়ার হওয়া আর চেষ্টা করা। যে-আশা এতটুকু কর্ম্মশক্তি আমাদের ভিতরে জাগায় না তা হয় আশার ভান, না হয় আশার আশায় দিন কাটানো। তাতেও অবশ্য

দীর্ঘদিন কাটতে পারে—জগতের বহু পতিত সমাজের তেমন কাটছে। কিন্তু যে কথাটা বলতে শুরু করেছিলাম—মহাপুরুষের সত্যকার মর্য্যাদা তাঁদেরই কাছে যাঁরা তাঁকে বুঝতে চান, তাঁর সাধনার আগুনে নিজেদের জীবন-দীপ জ্বালাতে চান। তাঁরা কার শিষ্য সে কথা তাঁদের মুখের উক্তি আর দেহের পোষাক-পরিচ্ছদ দেখে বুঝতে হয় না, তা বুঝিয়ে দেয় তাঁদের সমগ্র জীবন। এইই সত্যকার গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ—স্বাভাবিক আর সনাতন। এই স্বাভাবিক ও সনাতন সম্বন্ধ দেখুন বুড়ো গাছ আর তার বীজ থেকে উৎপন্ন চারাগাছের মধ্যে, বৃদ্ধ পিতা আর যুবক পুত্রের মধ্যে, মালীর যত্ন আর স্বাস্থ্যে-লাবণ্যে-ভরপুর বাগানের মধ্যে।

বশীরুদ্দিন

তাহলে আপনার মতে বর্ত্তমান ধর্ম্ম-সম্প্রদায়গুলো অর্থহীন?

আলি গওহর

একদিন এসব অর্থপূর্ণ ছিল, তখন এক একটি ধর্ম্ম-সম্প্রদায় প্রকৃত-পক্ষে ছিল এক একটি রাষ্ট্র—জীবনায়োজনের এক একটি কেন্দ্র। কিন্তু আজ ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলো সত্যই অর্থহীন।

বশীরুদ্দিন

আপনি জোর করে একথা বলছেন গওহর সাহেব। আপনি নিজেও যে একটি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক আপনার সেই পরিচয় নিশ্চিহ্ন করেন নি আজো।

আলি গওহর

পাহাড়ের ঝরণাগুলো বহু স্থানে উৎপন্ন হয়ে নীচে নেমে মিলিত হয়ে নদীর সৃষ্টি করে। সেই সঙ্গম-স্থানে দাঁড়ালে ঝরণা আর নদী দুইই চোখে পড়ে। কিন্তু ঝরণা যে নদী হয়েছে, নদী হয়ে সার্থক হয়েছে এইই আসল কথা। সেকালের ধর্ম্ম-সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, বংশ,

এখন এক নতুন সার্থকতা লাভ করতে চলছে জাতীয়তায় আর আন্তর্জাতিকতায় বৈজ্ঞানিক সত্যের নির্দ্দেশ শিরোধার্য্য করে। আজ মানুষের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি ধরেছে এই জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার দৃঢ় যোগের রূপ।

বশীরুদ্দিন

কিন্তু সত্যই কি তাই—মানুষ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, বংশ, এই সব প্রাচীন বাঁধন সত্যই কাটাতে চাচ্ছে! এ সব নিয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তিই কি এখনো জগতে প্রবল ভাবে চলছে না!

আলি গওহর

খুব চলছে। কিন্তু সেই চলার রকমটা একটু খুঁটিয়ে দেখা দরকার। ধ্বস্তাধ্বস্তি আজ বাস্তবিক পক্ষে চলেছে জাতিতে জাতিতে—রুটির জন্যে বা রুটির কম্‌তির ভয়ে। বংশ, গোষ্ঠী, ধর্ম্ম, এসবের কথা যে তোলা হচ্ছে সে ছলনা মাত্র। কিন্তু কাড়াকাড়ি করে রুটির পরিমাণ বাড়ানো যাবে না, রুটির ব্যবস্থাও নিরাপদ করা যাবে না—বিজ্ঞানের প্রভাবে এই অত্যন্ত-ছোট-হয়ে-পড়া জগতের জাতিরা বা পাড়াপ্রতিবেশীরা তা বুঝতে বেশী দিন নেবে না।

বশীরুদ্দিন

আপনি এক বিষয়ে সুখী—নৈরাশ্য আপনাকে কাবু করতে পারে না। কিন্তু কে জানে এমন কাড়াকাড়ি করাই মানুষের ভাগ্য কি না—মনুষ্যত্বে জ্ঞানে খানিকটা এগোনো, আবার মারামারি করতে করতে বর্ব্বরতার দিকে পেছোনো।

আলি গওহর

একথা ত আপনার সঙ্গে হয়েছে। এ শেষ পর্য্যন্ত রুচি আর বিশ্বাসের কথা। যা সত্য আর কল্যাণকর ব'লে জানা গেছে তাইই মানুষের জন্য কাম্য, তার জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করতে হবে জয়ী হবই এই

আশা মনে রেখে—আমার প্রবণতা এই দিকে। সৌভাগ্যক্রমে এক্ষেত্রে আমি পূর্ব্ববর্ত্তীরূপে পেয়েছি জগতের যাঁরা নমস্য, বড় বড় মতের প্রবর্ত্তক, তাঁদের। পদ্ধতি ও প্রয়োগ কাল-ভেদে বিভিন্ন হবেই—আজ আর কেউ তীর ধনুক নিয়ে লড়াই করে না—কিন্তু তাঁদের এই অন্তরতম বিশ্বাসের কথা ভেবে বুঝি, আমি তাঁদেরই দাসানুদাস। আপনার একটি বড় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়নি—আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস না রাখলে মানুষ ভাল কাজে জোর পায় কি না। আমারও উত্তর—পায় না। তবে আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস, সত্যের অন্বেষণ, মানুষের কল্যাণকর কাজে আত্মনিয়োগ, এসব আমার কাছে এক অখণ্ড ব্যাপার—সূর্য্য আর তার ছড়িয়ে-পড়া কিরণ যেমন এক অখণ্ড ব্যাপার। এর কোনো একটি যদি কারো ভিতরে দেখি জীবন্ত তবেই মনে হয় তার সম্বন্ধে নির্ভয় হওয়া যায়; মুখে সে যে মতই প্রচার করুক তার সঙ্গে আমার সত্যকার বিরোধ নেই—আমরা দুজনেই চলেছি জীবনের বিকাশ ও ব্যবহারের পথে।

বশীরুদ্দিন

কিন্তু তা ত সত্য ব'লে মনে হয় না। ধরুন আপনার অত্যন্তপ্রিয় স্বদেশ-সেবা। স্বদেশ-সেবক দেখতে দেখতে হয়ে ওঠে পরদেশ-পীড়ক। স্বদেশপ্রেমে আর বিজ্ঞানে দীক্ষিত জাতিরা আধুনিক সভ্যতার ধ্বংস ঘটাতে পারে এ আশঙ্কা অমূলক নয়।

আলি গওহর

আগে যেমন স্বধর্ম্ম-প্রেম মানুষের সমাজে রক্তারক্তির কারণ হয়েছে এখন জাতীয়তা ও স্বদেশপ্রেমও তাই হচ্ছে, এ মিথ্যা নয়। মাত্রা-বোধ মানুষের সহজে জন্মাতে চায় না। তবে এক দিক দিয়ে একালের মানুষের কিছু উৎকর্ষ সাধন হয়েছে বলেই মনে হয়। ধর্ম্মের যা উপজীব্য সেই ঈশ্বর আর পরকাল মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাইরের জিনিষ।

এজন্য ধর্ম্মে ধর্ম্মে সংঘর্ষে ভাবালুতাই ছিল বড় শক্তি। কিন্তু জাতির বা স্বদেশের উন্নতি অবনতি চোখ দিয়ে দেখবার মতো ব্যাপার। তাই ভাবালুতা এক্ষেত্রে বেশী দিন চল্‌তে পারে না। যাঁরা বলেন বিজ্ঞান আর স্বদেশ-প্রেম একালে মানুষের সভ্যতার ধ্বংস ঘটাবে তাঁরা একটা বিষয় লক্ষ্য করতে ভুলে যান; মানুষের সভ্যতা তখনই ধ্বংসের পথে দাঁড়ায় যখন অজ্ঞানতা তার মনে প্রবল হয়। কিন্তু এযুগের বিজ্ঞান আর বৈজ্ঞানিকতা মানুষকে বুঝিয়েছে, সত্য আর কল্যাণ মানুষের প্রতিদিনের জীবনে পরীক্ষা করে দেখবার বিষয়, সে-পরীক্ষায় যা উত্তীর্ণ হলো না তাকে সত্য ও কল্যাণের মর্য্যাদা দেওয়া যায় না। একালের মানুষের মন যে বেশী সজাগ, তার শ্রেষ্ঠ জ্ঞান যে সেকালের মতো গুপ্ত বিদ্যা নয়, এ মানুষের এক বড় লাভের বিষয় হয়েছে।

বশীরুদ্দিন

বিজ্ঞানের চর্চায় আর মানুষের জাগতিক উন্নতিতে আপনার যখন এতখানি বিশ্বাস তখন আল্লাহ্‌র কথা আপনার না তোলাই বোধ হয় ভাল।

আলি গওহর

আল্লাহ্‌র কথা সাধারণতঃ আমি তুলি না। তবে নিজের মনে ও কথাটা ভুলতে পারি না। ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে দেখেছি, বিজ্ঞানের সাধনা, বুদ্ধির সতর্কতা, সীমাহীন জাগতিক উন্নতি, মানুষের জন্য এই সব কাম্য বাস্তব হয়ে উঠবার অশ্রান্ত প্রেরণা আমার মধ্যে পাচ্ছে একটি সুগুপ্ত শুভ-ইচ্ছা থেকে। সেই শুভ-ইচ্ছার সঙ্গে যাঁকে আল্লাহ্ বলা হয় সেই পরম-ইচ্ছা-শক্তির কি রকম একটা যোগ ঘটেছে আমার মধ্যে, বলতে পারবো না। মনে হয়, গাছের মূলের মতো মানুষেরও সমস্ত রকমের শক্তির মূলতত্ত্ব সুগুপ্ত থাকাই বিশ্ব-বিধান। গাছের স্বাস্থ্য বুঝতে হয় তার ডাল-পালার বাড় আর ঋতুতে ঋতুতে ফল ফুল

দেখে ; মানুষেরও বলিষ্ঠতার পরিচয় তার প্রতিদিনের জীবন-যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মে।

(ধীরেন্দ্রলাল ও গোলাম মণ্ডলার প্রবেশ)

আসুন ধীরেন বাবু, আসুন মণ্ডলা সাহেব।

[গাত্রোত্থান, অভিবাদন-প্রত্যভিবাদন, আসন গ্রহণ।]

গোলাম মণ্ডলা

মণ্ডলানা সাহেবকে এখানে দেখে খুশী হলাম। বোঝা যাচ্ছে গওহর সাহেব এবার জাতে উঠছেন।

ধীরেন্দ্রলাল

না উঠে আর কত দিন থাকবেন। পাখী যতই আকাশে উড়ুক, বনে বনে বেড়াক, বাসায় তাকে ফিরতেই হয়।

আলি গওহর

দুর্ভাগ্যক্রমে মানুষের বাসা আর পাখীর বাসা একরকমের নয় ধীরেন বাবু। মানুষের বাসা যে কোথায় তার সন্ধানে তাকে ফিরতে হয় জীবনের বেশীর ভাগ সময়।

ধীরেন্দ্রলাল

সে-তর্ক আপনার সঙ্গে বহুবার হয়েছে। কিন্তু এ বিশ্বাস আমার মনে এখনো প্রবল যে আপনার মত বদ্‌লাবেই যদি এরই মধ্যে বদলাবার পথে দাঁড়িয়ে না থাকে।

আলি গওহর

যদি বদলায় তবে সে-সংবাদ আপনার অজানা থাকবে না। চাইকি সে-উপলক্ষে যদি একটি পার্টি দেন তবে আমি খুশী হয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করবো। কিন্তু সে সম্ভাবনা এখনো দেখা যাচ্ছে না। আপাতত,

বলুন সুজিতের কথা। তার সঙ্গে দেখা হয়েছে? আলাপ-আলোচনা কিছু হয়েছে?

ধীরেন্দ্রলাল.

দেখা ছিল সেদিন "সত্যসখা" আপিসে। তুমুল তর্ক হচ্ছিল সম্পাদকের সঙ্গে। আমি আর তাতে যোগ দিলাম না। তাঁর কথা-বার্ত্তা শুনে আমার চক্ষু স্থির।

বশীরুদ্দিন

কেন, কি তিনি বলছিলেন?

ধীরেন্দ্রলাল

বলবেন আর কি—সোজা রাশিয়া করে তুলতে হবে দেশটাকে, এইসব।

বশীরুদ্দিন

রাশিয়ার মতো সবাইকে নাস্তিক হতে হবে, বিয়ের প্রয়োজন থাকবে না—এই সব নাকি?

ধীরেন্দ্রলাল

উন্নতি অতটা হয়েছে কি না সেদিন জানা যায় নি, আজ যাবে। দেখি গওহর সাহেবের বিজ্ঞানবাদ আর প্রগতিবাদের তাল তার সঙ্গে পাল্লায় শেষ পর্যন্ত থাকে না কাটে।

গোলাম মওলা

গওহর সাহেবের সে ভয় আছে মনে হয় না। উনি তালের এত রকমফের জানেন যে বেতাল বলে কোনো কিছু আছে উনি যেন তা স্বীকারই করেন না। কিন্তু ওঁর মতকে বিজ্ঞানবাদ আর প্রগতিবাদ বলে আপনি ত ঠকৃছেন ধীরেন বাবু। তাহলে আপনার মত কি বিজ্ঞান আর প্রগতির বিরোধী?

ধীরেন্দ্রলাল

বিজ্ঞান আর প্রগতির বিরোধী হবার শক্তি কার আছে। কিন্তু বিজ্ঞান-বাদ আর প্রগতি-বাদ একটু স্বতন্ত্র জিনিস। ভোজনে কারো অপ্রীতি না হতে পারে, কিন্তু অতিভোজনে আনন্দ সবার নাও হতে পারে।

গোলাম মওলা

মওলানা সাহেব এইবার ব্যবস্থা দিন হরুঠাকুরের বিধবা যে দিনান্তে চাট্টি আতপচাল সিদ্ধ খান সেটি ভোজন আর গোরা ডিক যে রোজ দেড়সের গোমাংস খায় সেটি অতিভোজন কি না।

ধীরেন্দ্রলাল

কিন্তু এই দৃষ্টান্ত দিয়ে খুব যে জিতে যাবে তা ভেবো না মওলা। বোধ হয় জানো তোমার ঐ ডিকদের চাইতে হরুঠাকুরের বিধবাদের সুস্থদেহে দীর্ঘদিন বাঁচবার সম্ভাবনা বেশী।

গোলাম মওলা

এমন একটা জলজ্যান্ত ব্যাপার না জেনে আর উপায় কি। তবে আর একটা জলজ্যান্ত ব্যাপারও আছে, কিন্তু সেদিকে আমাদের চোখ পড়ে খুব কম। সেটি এই যে এই হরুঠাকুরের ব্রাহ্মণীরা চালকলা খেয়ে দীর্ঘদিন বেঁচে শান্তিতে নাম জপ করেন ঐ ক্ষণজীবী ডিকদের উঁচানো ব্যায়োনেটের নীচে বসে।

ধীরেন্দ্রলাল

কিন্তু রোজ দেড়সের গোমাংস গলাধঃকরণের জন্যেই কি ডিকদের হাতে ব্যায়োনেট উঠেছে ?

গোলাম মওলা

তা হয়ত ওঠে নি। কিন্তু হরুঠাকুরের পরমশুদ্ধাচারিণী ব্রাহ্মণীদের

রক্ষণাবেক্ষণের জন্মে ম্লেচ্ছাচারী ভিকদের যে ছুটে আসতে হয় এ দেখা যাচ্ছে বহুদিন ধরে।

ধীরেন্দ্রলাল

তা মণ্ডলা সাহেব বেরিয়ে পড় না দেশে এই সুসমাচার প্রচার করতে যে গরু শূয়োর ব্যাঙ গিরগিটি সব দেশের লোক খাক, পূজো-আহ্নিক নামাজ-রোজা ছেড়ে দিক, তাহলে দেশের উন্নতিতে কোনো বাধা থাকবে না। নতুন করে তারা বেরুবে জগৎ জয় করতে।

গোলাম মণ্ডলা

তা যাইই বলুন ধীরেন বাবু, মাঝে মাঝে নিজেকে সামলানো দায় হয়ে ওঠে। ইচ্ছা হয় চেঁচিয়ে বলি—ফেলে দাও তোমাদের যত সব ধর্ম্ম-কর্ম্ম, চুকিয়ে দাও অতীতের সংস্রব, চল ইয়োরোপ আমেরিকা যে পথে চলেছে। তা আর বলা হয় না, চেপে যাই।

ধীরেন্দ্রলাল

তা চেপে যাও কোন্ দুঃখে। বলে ফেললেই পার মুখে যা আসে। আশ্চর্য্য আমাদের দেশের শিক্ষিত-সমাজ। দেশের উন্নতি অবনতি, তার প্রাচীন ঐতিহ্য, এসব গুরুতর বিষয়ে এত হাল্কাভাবে তারা কথা বলতে পারে!

আলি গওহর

কিন্তু হাল্কাভাবে ত নয় ধীরেন বাবু। দেখছেন দেশের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে মণ্ডলা সাহেব মাঝে মাঝে রীতিমতো অস্থির হয়ে ওঠেন।

ধীরেন্দ্রলাল

অস্থির হয়ে ওঠেন তার বড় কারণ, স্থির হবার ইচ্ছাটা কম। জাতি সমাজ, এসব ত ফুটবল নয় যে সংস্কারকের এক লাথিতে বহুদূর এগিয়ে যাবে!

(সুজিৎ রায়ের প্রবেশ)

আসুন আসুন—পাঠান কহে তোমারি পথ চেয়ে চক্ষুদুটি হয়েছে মোর কানা।

[অভিবাদন-প্রত্যভিবাদন, পরিচয় দান, আলি গওহর সুজিৎকে আলিঙ্গন করলেন।]

আলি গওহর

সুজিতের আসতে ঘণ্টা আধেক দেরী হয়েছে। কিন্তু আজ এ'কে দেরী বলবো না। এ ঠিক সময়। আজ সময়ের দাস আমরা নই, তার প্রভু—অন্ততঃ আজকার রাত্রির জন্যে।

সুজিৎ

শুধু আজকার রাত্রির জন্যে কেন চিরকালই ত আমরা সময়ের প্রভু—আমরা ভারতবাসী, ত্রিকালজ্ঞদের বংশধর। কিন্তু আমার দেরী হয়েছে অতি সাধারণ কারণে। সুনীল নামে একটি ছেলে—সে ধীরেন বাবুর খুব ভক্ত—এসে বল্লে, প্রাচীন ইতিহাসের ধারা, জাতীয় বৈশিষ্ট্য, এসব ভুলে আমি কেমন করে সমাজতন্ত্রের একাকারত্ব প্রচার করছি। ছেলেদের আমি কিছু বেশী আস্কারা দিই। তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলতে হয়েছে।

আলি গওহর

তা চেলার কথা থাকুক, স্বয়ং গুরু এখানে উপস্থিত—জাতিগত বৈশিষ্ট্য, বংশগত বৈশিষ্ট্য, ধর্ম্মগত বৈশিষ্ট্য, এসব মতবাদের মূর্তিমান বিগ্রহ রূপে।

সুজিৎ

ধীরেন বাবু কি সত্যই বিশ্বাস করেন, বংশ ধর্ম্ম জাতি এসবের বৈশিষ্ট্য মানুষের জন্য খুব বড় কথা?

ধীরেন্দ্রলাল

না বিশ্বাস করে উপায় কি বলুন। যা সত্য তাকে ত স্বীকার করতেই হবে।

সুজিৎ

একদিন এসব ধারণা লোক সত্য বলে ভাবতো, এসব কার্য্যকরীও ছিল। কিন্তু আজ এসব ত মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে, কার্য্যকারিতাও এসবের আর নেই।

ধীরেন্দ্রলাল

আমি কিছু আশ্চর্য্য হচ্ছি আজকার দিনেও আন্তর্জ্জাতিকতা, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, এসবের কার্য্যকারিতায় আপনার এত বড় বিশ্বাস দেখে। জোর প্রমাণ ত এখন বংশ ও জাতির পক্ষেই।

সুজিৎ

আপনি হিট্‌লারের জাতীয়তা আর আর্য্যামির কথা বলছেন?

ধীরেন্দ্রলাল

ঠিক হিট্‌লারের নয় জার্ম্মান জাতির। জার্ম্মানী ত বেঁচে উঠলো তার জাতিগত ও বংশগত ঐক্য উপলব্ধি করে।

সুজিৎ

কিন্তু তার গোড়ার কথা ত অর্থনৈতিক। মিত্র-শক্তি জার্ম্মেনীকে বিধ্বস্ত করতে চাইলে ভার্সাইয়ের সন্ধি দিয়ে। হিটলার সেই ঘায়েল-করা জার্ম্মানীর তর্জ্জন গর্জ্জন। ওঁর আর্য্যামি লোক ভুলানোর উপায় মাত্র।

ধীরেন্দ্রলাল

লোকে কি আর অমনি ভোলে ভোলার কারণ না থাক্‌লে। জল সেইদিকে যায় যে দিকটা ঢালু।

সুজিৎ

কিন্তু একথা আজ সবাই জানে যে, অমিশ্র জাতি বলে জগতে কোথাও কিছু নেই।

ধীরেন্দ্রলাল

পুরোপুরি অমিশ্র জাতি নাই বা থাকলো। জাতির কাঠামো বলে একটা জিনিস আছে। বহু দিন ধরে যারা নিজেদের মনে করছে এক জাতি বলে তারাই এক জাতি। আর এই মনে করাটা সম্ভবপর হয় কতকগুলো গোড়াশক্ত কারণে।

সুজিৎ

যে যে কারণের বশীভূত হয়ে কতগুলো লোক নিজেদের এক জাতি বলে মনে করতে পারে তা বদলে বদলে যায়। আর তার ফলে অনেক ছোট ছোট জাতি মিলে বড় জাতি হয়। বড় জাতি ভেঙে ছোট ছোট জাতি হয়। এ ইতিহাসের কথা।

ধীরেন্দ্রলাল

হাঁ—প্রাচীন ইতিহাসের কথা। এই সব ভাঙাগড়া কালে কালে বিশেষ বিশেষ রূপ নিয়েছে, তার আর তেমন বদল হচ্ছে না।

সুজিৎ

কিন্তু ধনী-নির্ধনের দ্বন্দ্ব ত একালে বাস্তবিকই জগদ্ব্যাপী হয়েছে—হিটলার আর মুসোলিনী তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না।

ধীরেন্দ্রলাল

সেটা আপনার নিজের বিশ্বাস। পারছে যে তারই লক্ষণ দেখা যাচ্ছে বেশী। আপনার পরম প্রিয় রাশিয়াও আজ নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত—বিশ্বব্যাপী নির্ধন-প্রাধান্য স্থাপনে তার উৎসাহ মন্দীভূত হয়েছে।

আলি গওহর

আমাদের তর্কটা কিন্তু ঘুলিয়ে যাচ্ছে। ধীরেন বাবুর প্রধান বক্তব্য বোধ হয় ছিল—হিন্দুর বৈশিষ্ট্য মুসলমানের বৈশিষ্ট্য এসব সত্য বস্তু। এখন জানা দরকার, জার্ম্মান রুষীয় এসব জাতি যেমন সত্যবস্তু হিন্দু মুসলমান এই সব ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ও তাঁর মতে তেম্‌নি সত্যবস্তু কি না।

ধীরেন্দ্রলাল

কিন্তু সে কথা জেনে আপনাদের লাভ? আপনারা হচ্ছেন বিশ্ব-প্রেমিক, রাজনৈতিক জাতীয়তাও ত আপনাদের কাছে প্রায় অর্থহীন—ধর্ম্ম, প্রাচীন সংস্কৃতি, এসবের কথা আর আপনাদের কাছে তোলা কেন?

আলি গওহর

আপনিও ত কম বিশ্বপ্রেমিক নন ধীরেন বাবু। বিশ্বকে আপনি কৃতার্থ করতে চান আপনার প্রাচীন ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির মাহাত্ম্য দেখিয়ে।

গোলাম মওলা

গওহর সাহেব ঠিক বলেছেন। ধীরেন বাবু একশ্রেণীর সাম্রাজ্য-বাদী। সাম্রাজ্যবাদীরা যেমন চান সাম্রাজ্যের গৌরব, তার অধীনে যারা আছে তারা সুখে আছে না দুঃখে আছে সেটি তাঁদের ভাবনার বিষয় নয়, ধীরেন বাবুর মতো চিন্তানেতারাও সেই পথের পথিক।

ধীরেন্দ্রলাল

আজ আমার জীবনের একটি শুভ দিন বলতে হবে। আপনাদের প্রদত্ত জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় আমার অন্তশ্চক্ষু উন্মীলিত হলো—আত্মজ্ঞান লাভ হলো। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, দেশ কি আপনাদের প্রগতি-সজ্জের পরিধির মাপে তৈরি?

আলি গওহর

যদি স্বচ্ছন্দে উত্তর দিই—হাঁ, আশা করি তাহলে আশ্চর্য হবেন না। আসলে বীজের পরিমাপেই ত গাছ।

ধীরেন্দ্রলাল

প্রকৃতি ঠাকুরুণ বড়ঘরের মেয়ে—অপব্যয়ে তাঁর মহা আনন্দ। বীজ ফলান তিনি ঢের, কিন্তু গাছ হয় তার অল্প কয়েকটা থেকে। তারও বেশীর ভাগ নষ্ট হয় চারা থাকতে। ফলবান গাছের সংখ্যা বীজের তুলনায় নগণ্য।

আলি গওহর

কিন্তু প্রকৃতি ঠাকুরুণের খেয়ালীপণা এখানেই থামে না। সেই ফলবান গাছও কালে নষ্ট হয়, আবার আসে নতুন চারার পালা। যাঁদের বাগানের সখ আছে তাঁরা এ কথা জানেন—নতুন গাছ জন্মাবার দিকে তাঁদের মহা ঝোঁক। প্রকৃতি ঠাকুরুণের মেজাজ ও মর্জ্জির তাঁরা সমঝদার।

ধীরেন্দ্রলাল

ওহো আমার ভুল হয়েছিল! বর্ত্তমান জগতের বিশ্বব্যাপী ধর্ম্মের গ্লানির দিনে নতুন অবতারের আবির্ভাব ত চাইই। কিন্তু জানা দরকার সেই অবতার সত্যই এসেছেন, না আপনারা তাঁর সুসমাচারবাহী জন-দি-ব্যপ্‌টিষ্ট। মওলানা সাহেব কি বলেন? একালে ধর্ম্মের বড় দুর্গতি হয়েছে, লোক ধর্ম্মের নামে নানা অনাচার করছে, এ সময়ে ত একজন পয়গম্বরের আসা দরকার নতুন ধর্ম্ম প্রচার করতে। আপনাদের শাস্ত্রে কি বলে?

বশীরুদ্দিন

শাস্ত্রের কথা আর কেন তুলছেন? আপনারা ত বাস্তবিকই শাস্ত্র মানেন না।

গোলাম মওলা

বলেন কি মওলানা সাহেব! ধীরেন বাবু শাস্ত্র মানেন না! হিন্দুর শাস্ত্রের যে উনি একালের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা।

বশীরুদ্দিন

শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা ত আপনারা সবাই। কিন্তু ব্যাখ্যাতা হওয়া আর শাস্ত্র মানা ঠিক এক কথা নয়। আমি ত বুঝি, শাস্ত্র মানার অর্থ—নিজের বিচারবুদ্ধির উপরে শাস্ত্রের প্রাধান্য দেওয়া।

ধীরেন্দ্রলাল

আপনি ঠিকই বোঝেন মওলানা সাহেব। যাকে আমরা বিচার-বুদ্ধি বলি সেটি অনেক সময়ে প্রচ্ছন্ন অহমিকা। যুগযুগান্তরের যে জ্ঞান শাস্ত্রের নির্দ্দেশের মধ্যে সংহত হয়েছে, নিজের বিচারবুদ্ধিকে তার অধীন করাতেই সত্যকার বিচারবুদ্ধির পরিচয়।

আলি গওহর

অহমিকা বড় সাংঘাতিক বস্তু। তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া দায়। যখন আমরা জোর করে তাকে লাগাতে চাই কোনো বড় আদর্শের সেবায় সেবকের দীন বেশ দিয়ে সে ঢেকে রাখে তার ভয়াবহ স্বরূপ।

ধীরেন্দ্রলাল

তাহলে আপনি বলতে চান, প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্ম কেউ মানে না?

আলি গওহর

প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্ম ভিন্ন মানুষ আর কি মানতে পারে বলুন? আমি বলতে চাই, যে ভাবে মানুষ বিভিন্ন ধর্ম্মের লোক বলে নিজেদের পরিচয় দেয়, আর সেই পরিচয় দেবার জন্যে উৎকণ্ঠার আর তাদের অন্ত নেই—সেটি আমার কাছে বেশ অদ্ভুত।

ধীরেন্দ্রলাল

অর্থাৎ আপনি বলতে চান যারা নিজেদের হিন্দু মুসলমান বা খৃষ্টান বলে পরিচয় দিয়ে গৌরব বোধ করে তারা অদ্ভুত, অন্য কথায়, হয় ভণ্ড নয় আহাম্মক!

আলি গওহর

কে ভণ্ড আর কে আহাম্মক অত খোঁজ নেবার কারো কি সময় আছে ধীরেন বাবু? যারা নিজেদের হিন্দু মুসলমান বা খৃষ্টান বলে পরিচিত করবার জন্যে ব্যস্ত তাদের অদ্ভুত ভিন্ন আপনিই বা আর কি বলবেন?

ধীরেন্দ্রলাল

কেন—তাদের স্বাভাবিক মানুষ বলবো। স্বাভাবিক মানুষের পরিচয় এই যে তার বিচিত্র ক্ষুধা—অন্নের ক্ষুধা, আরামের ক্ষুধা, সঙ্গের ক্ষুধা। এম্‌নি স্বাভাবিক ক্ষুধার বশবর্ত্তী হয়েই মানুষ নিজেদের হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান বৌদ্ধ বলে। যারা বলে না তারা হয়ত অস্বাভাবিক মানুষ। তাদের স্বাভাবিক ক্ষুধা বিনষ্ট হয়ে অগ্নিমান্দ্য ধরেছে কি না তার সন্ধান নেওয়া দরকার।

সুজিৎ

গওহর, তুমি ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেছ। আমাদের অগ্নি-মান্দ্য ধরেছে কি না এ সন্দেহ প্রকাশের অবসর তুমি ধীরেন বাবুকে কেন দিলে? তার পূর্ব্বেই কেন আমাদের কাছ থেকে চাক্ষুষ প্রমাণ তিনি পেলেন না?

(হাসিনার প্রবেশ। সকলের গাত্রোত্থান, অভিবাদন-প্রত্যভিবাদন)

হাসিনা

এ অপরাধ জ্ঞানীদের কাছে যারা চিরঅপরাধিনী তাদের একজনের। যে-আনন্দে আপনারা ভাবের স্বর্গোদ্যানে বিচরণ করছিলেন মর্ত্ত্যের আকুল আবেদন সেখানে পৌছুতে স্বতঃই কুণ্ঠিত হচ্ছিল। যদি দৈবাৎ

সেই অকিঞ্চন মর্ত্ত্যের পানে দেবতাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়ে থাকে তবে মর্ত্ত্য কৃতার্থ হবার সুযোগ পাক্।

আলি গওহর

দেবতারা নন্দনবিহারী সত্য, কিন্তু একান্তভাবে মর্ত্ত্যের ভক্তের অধীন। ভক্তের প্রাণে আকুলতা জাগ্‌লে তাঁরা বিচলিত না হয়ে পারবেন কেন!

গোলাম মওলা

হিন্দু পুরাণ মতে ভক্তের প্রতি দেবতাদের এত প্রীতি যে ভক্ত-পদচিহ্ন দেবতার এক শ্রেষ্ঠ ভূষণ।

ধীরেন্দ্রলাল

সেই শ্রেষ্ঠ ভূষণে ভূষিত দেবাদিদেব বিষ্ণু। আর আর দেবতারা পূজা পেয়েই মহাখুশী।

(সকলের হাস্য)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ভোজন-কক্ষ—আহার্য-সজ্জিত টেবিল—দুই ভৃত্য সেবারত।]

ধীরেন্দ্রলাল

মিসেস গওহর এখনো আসন গ্রহণ করেন নি।

হাসিনা

করছি। প্রাচ্য নারীর সেবার অভিজ্ঞতা দীর্ঘ। সেই অভিজ্ঞতার গৌরব ভোলা তার পক্ষে কঠিন।

আলি গওহর

কঠিন হওয়াটা একান্ত মন্দ নয়। বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখ করেছেন স্বামীদের আহারের সময়ে আজকাল আর স্ত্রীরা কাছে বসে পাখার বাতাস করেন না—ভদ্রলোকের মেজাজটা যত কড়াই হোক রস-বোধ ছিল পুরোপুরি।

সুজিৎ

ধীরেন বাবু এইবার আমার আর সুজিতের পাতের দিকে তাকিয়ে দেখতে পারেন। অগ্নিমান্দ্যের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে মনে হয় না। বরং নিজেই অগ্রসর হচ্ছেন সন্তর্পণে।

ধীরেন্দ্রলাল

অগ্নিমান্দ্যের লক্ষণ প্রকাশ না পেয়ে যদি তীক্ষ্ণাগ্নির লক্ষণ প্রকাশ পায় সেটিও আনন্দ-সংবাদ নয়।

গোলাম মওলা

আবার সেই ভোজন-অতিভোজনের পুরোনো তর্ক এসে পড়েছে।

আলি গওহর

ধীরেন বাবু, ব্যাপারটা আপনার চোখে যে ভাবে পড়েছে, যাকে আপনি সুপরীক্ষিত মনে করছেন সেই পুরাতনের চাইতে অপরীক্ষিত নূতনকে যে আপনি আমল দিতে পারছেন না, এই ব্যাপারটি আমাকেও ভাবিয়েছে দীর্ঘ দিন। বেশী ভাবিয়েছে এই জন্যে যে আমরা একটা পরাধীন জাতি—সভ্যতা, আদর্শ-নিষ্ঠা, এসবের যেটুকু আমাদের মধ্যে আছে তাকে উপেক্ষা করে একটি মহত্তর কিন্তু অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পানে যদি ছুটি তবে আমার জনকয়েক বিদ্বান্-বুদ্ধিমান বন্ধু ও আমি না হয় ছুটলাম কিন্তু জনসাধারণকে কি সেই ভাবের ভাবুক করতে পারা যাবে! যার দ্বারা নতুন আদর্শকে জনসাধারণের মধ্যে কার্য্যকরী করা যায় সেই রাজশক্তির সাহায্যের আশা আমাদের নেই বরং বিরোধিতার আশঙ্কা আছে প্রচুর—সে-অবস্থায় এই ধরণের চেষ্টার ফল সমস্ত দেশের জন্য (শুধু দুচারজন শিক্ষিত লোকের জন্য নয়) একুল-ওকুল-দুকুল-হারার মতো হওয়াই কি বেশী সম্ভবপর নয়! কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত নিজের মনে উত্তর পেয়েছি—এ চিন্তাধারা আগাগোড়া ভুল। এ ভয়ের কথা, আর ভয় জীবনের শত্রু—মৃত্যুর দূত। জীবনের অর্থই বিকাশ—নির্বাধ বিকাশ—জ্ঞান আর কর্ম্ম দুই দিকেই। স্বাধীন, পরাধীন, সব দেশের জন্যই এ সত্য। রাজনৈতিক পরাধীনতা মানুষের জন্য একটা তুচ্ছ সাময়িক ব্যাপার। বাস্তবিক পক্ষে মানুষ কখনো পরাধীন হয় না—এ তার সহ্যই হয় না। পরাধীন কেবল সেই ব্যক্তি বা জাতিকে বলা যায় যার দেহ ও মন দুইই ক্ষয়ের অধীন হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের লোকদের কেমন করে ক্ষয়ের অধীন ভাবতে পারি প্রবলভাবে ভাল আর প্রবলভাবে মন্দ দুরকম লোকেরই জন্ম আজো যখন আমাদের মধ্যে হচ্ছে—দুর্ভিক্ষ আর ব্যাধি আজো যখন তার জয়-চিহ্ন আমাদের ললাটে এঁকে দিতে পারেনি। তাই বাধা আমাদের

সাম্‌নে কত রকমের আছে তা সত্যকার ভাবনার বিষয় নয়, ভাবনার বিষয়—বাধা জয় করে জীবন-বিকাশের সংকল্প আমাদের মধ্যে কতখানি প্রবল হয়েছে। এই প্রবল সংকল্প মৃত্যু-জয়ী। এইই জীবনের রূপ। অপূর্ব্ব এর প্রেরণা। জীবনের সমস্ত বিড়ম্বনার উপরে এর জয়ী হবার অধিকার বিধাতার দেওয়া। এই দুর্ব্বার সংকল্পের আমি আজ্ঞাবহ সৈনিক। সৈনিকের কাজ হুকুম তামিল ভিন্ন আর কিছু ত নয়।

ধীরেন্দ্রলাল

এই সংকল্পের আজ্ঞাবহ সৈনিক হতে কার না সাধ। আমিও নিজেকে এমন একজন সৈনিক বলেই জানি। কিন্তু যুদ্ধ ব্যাপারটা ত শুধু তলোয়ার হাতে সাম্‌নে ছোটা নয়! যুদ্ধের খুব বড় বিষয় হচ্ছে সৈন্য-পরিচালনা—আগে পিছে ডাইনে বাঁয়ে প্রয়োজন মত সব দিকেই। বিপক্ষের বল-বিক্রমের দিকে সব সময়ে দৃষ্টি রাখা যোদ্ধার জন্য অপরিহার্য্য।

আলি গওহর

সাধারণ যুদ্ধে আর জীবন-যুদ্ধে যে তফাৎ সেটি ভুলবেন না ধীরেন বাবু। সাধারণ যুদ্ধে একটি বিশেষ জয়ই লক্ষ্য, সৈন্য পরিচালনা হয় সেই লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে। কিন্তু জীবন-যুদ্ধ প্রতিদিনের, প্রতি-মুহূর্ত্তের। এ যুদ্ধে ফন্দির স্থান তাই নেই। এতে প্রয়োজন সদাজাগ্রত আয়োজনের, যে পথে জীবন সত্যই বিকশিত হতে পারে সেই পথে অক্লান্ত পদচারণার। এই সদাজাগ্রত আয়োজনে ফোটে জীবনের যে দীপ্তি, যে অজর মহিমা, তার সামনে দ্বিধা আর ভয় পথ ছেড়ে দাঁড়ায় চিরদিন—অরুণ-আলোর পথ ছেড়ে দাঁড়ায় যেমন আঁধার।

সুজিৎ

ভাই গওহর, দীর্ঘ দিন কাটিয়ে এলাম নানা দেশে। সৌভাগ্য হয়েছে এই দুটো চোখ দিয়ে জগতের এক বড় রকমের ভাঙা-গড়া দেখবার।

দেশে ফিরেও দেখছি, দেশ বসে নেই, ভাল আর মন্দ দুয়ের ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু হয়েছে। ছাড়া পেয়েই ভাবছি, এ লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করবো।

আলি গহওর

সে কথা আর তোমাকে বল্‌তে হবে কেন সুজিৎ। যেদিন শুনেছি তুমি দেশে ফিরেছ সেই দিনই সে কথা ভেবেছি। শুধু কৌতূহল জেগে আছে কোন্ কাজে তোমার মন যাবে তাই দেখ্‌তে।

সুজিৎ

সে বিষয়ে আমার নিজেরও কৌতূহল কম ছিল না। কিন্তু মীমাংসায় পৌঁছুতে দেরী হয়নি। কিন্তু যে মীমাংসায় পৌঁছেচি তাতে তোমাকে বিস্মিত করতে পারবো।

আলি গওহর

বিস্ময়ের সঙ্গে তোমার নিত্য-যোগ। তোমার সঙ্গে যাদের সম্পর্ক আছে তারা সে জন্যে প্রস্তুত থাকে। শুধু মাঝে মাঝে কিছু শঙ্কিত হই এই ভেবে যে বাংলার বোমাপিস্তলধারী আর রাশিয়ার লাল পতাকা-ধারী সুজিৎ সদ্‌গুরুর খোঁজে শেষে দণ্ডকমণ্ডলুধারী না হয়।

সুজিৎ

এ মিথ্যা ভয় নয় গওহর। গরম দেশের লোক আমরা, সহজে ক্লান্তির বশ। লড়া-ভেঁড়ায় ইস্তফা দিয়ে যোগাসনে বসবার ঝোঁক আমাদের পক্ষে সাম্‌লানো দায়। কিন্তু দেখছি এই দুই চোখ দিয়ে অতি ছোট যে তার জন্য অতি বড় যা সেই আয়োজন, আর মানুষের উপরে এমন সমাদরের জাদুশক্তি। যোগাসনের মায়া কাটাতে পেরেছি বলেই মনে হয়। কিন্তু কাজ কি করতে চাচ্ছি তা বলা হয় নাই। কংগ্রেসে যোগ ত দিয়েছিই, ম্যাকডোনাল্ড সাহেবের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কংগ্রেসের যে না-গ্রহণ-না-বর্জ্জন নীতি সেই দ্বিধা ঘুচিয়ে দিয়ে আমি

চাচ্ছি দেশ তা স্বীকার করুক পূর্ণভাবে—কতদিনের জন্য সে-প্রশ্নও না তুলে'। কেমন, যে ধর্ম্ম মানে না, বরং মনে করে তা মানুষের জন্য অনিষ্টকর, তার পক্ষে রাজনীতির ক্ষেত্রে তাকে স্বীকার করা অদ্ভুত নয়!

আলি গওহর

যা অদ্ভুত বলে' জানা গেছে তার অদ্ভুতত্ব ঘুচে গেছে। আমার কৌতূহল হচ্ছে তোমার যুক্তির ধারা বুঝতে।

সুজিৎ

সেই যুক্তির ধারাটা কেমন ক'রে চোখে পড়লো সেই কথাটাও তোমাদের শোনা দরকার। ঘটনাটা সাধারণ, কিন্তু যা সাধারণ, প্রতিদিন ঘটছে, তাইই চোখে পড়ে কম। নয়ীম নামে একটি অত্যন্ত গরীব ছোক্‌রা আমাদের বাড়ীতে চাকরি করতো। সে আমার বড় বাধ্য ছিল। অনেক দিন সে আমাদের পরিবারে চাকরি করে। আমি বাড়ী এসেছি শুনে একদিন সে আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। এখন সে করে ষ্টেশনে কুলিগিরি। অবস্থার তার কিছুমাত্র উন্নতি হয়নি। তবে দেখতে জোয়ান হয়েছে। তাকে বললাম, আমাদের এখান থেকে চলে গেলি কেন? কুলিগিরির চাইতে এখানে কি ভাল ছিলি নে? সে বললে, দুক্ষুর কপালে দুক্ষু ছাড়া আর সুখ কোথায় পাব। বল্‌লাম, তবু এতে কষ্ট বেশী হচ্ছে না কি? রোজগারই বা এমন কি করছিস? এদিক ওদিক একটু দেখে নিয়ে সে বল্লে, আপনাদের বাড়ীতে চাকরি করা বড় কষ্ট বাবু, উঠোনের এক কোণে বসে কুকুরের মতো খেতে হয়—নিজেরও সহ্য হয় না, জাতভায়েরাও বড় গালাগালি করে।—তার সঙ্গে এ বিষয়ে আর আলাপ করলাম না। তার কথাগুলো সম্প্রতি আমাকে কিছু বেশী করে' ভাবিয়েছে আমাদের দেশের হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক।

ধীরেন্দ্রলাল

কিন্তু হিন্দুর এই ছোঁয়া-ছুঁয়ি মূলতঃ ত বিদ্বেষের ব্যাপার নয়। অনেক নিষ্ঠাবান হিন্দু স্ত্রীর হাতেও খান না, নিজেরা রান্না করে খান। বাহ্য ও আন্তর শুচিতা সম্বন্ধে এ একটা চিন্তার ধারা—সাধনারও ধারা।

সুজিৎ

চিন্তার ধারা আর সাধনার ধারার ত অন্ত নেই ধীরেন বাবু। আফ্রিকায় কোনো কোনো আদিম জাতির সর্দ্দার মারা গেলে তার স্ত্রীদের ফাঁসি-লট্‌কে দেওয়া হতো তার অনুগামিনী হবার জন্যে; এদেশে হিন্দু-বিধবাদের স্বামীর শবের সঙ্গে কষে বেঁধে পোড়ানো হতো; কাপালিকরা নরবলি দিত—এ সমস্তই বিচিত্র চিন্তা ও সাধনার ধারা। আর এখন যে মুসলমানরা ঘটা করে' কোরবাণী দেয় বেশ তৈরি হয়েছে এমন সব গরু দেখে,' আর গোমাতার নিধন হলো বলে' হিন্দুরা হয় রুখে আসে নয় কাঁদে, এ সবও চিন্তা আর সাধনার ধারা।

বশীরুদ্দিন

আপনি যখন ধর্ম্ম মানেন না তখন ধর্ম্মের বিধি-বিধান সম্বন্ধে কিছু নাইবা বল্লেন সুজিৎ বাবু। আপনার রাজনৈতিক মতামত শুনবার জন্যে আমরা সবাই খুব উৎসুক হয়েছি এ কথা আমি বলতে পারি।

সুজিৎ

ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু বলতে আমারও রুচি হয় না। তবে এই ধার্ম্মিকদের দেশে বাস করে' কেন ধর্ম্ম মানি না সে-জবাবদিহি আপনা থেকে এসে পড়ে। তা থাকুক এই ধর্ম ও সাধনার পাঁক ঘাঁটায়—বিজ্ঞান-সূর্য্যের তাপে আপনি এর শোধন হয়ে যাবে। আমার রাজনৈতিক মতামতের গোড়ার কথা দাঁড়িয়েছে বর্ণ-হিন্দুদের অবিবেচনা যার প্রতি-ক্রিয়ায় দেখা দিয়েছে মুসলমান আর অস্পৃশ্যদের বিক্ষোভ। এই

বিক্ষোভের ভিতরে ন্যায় ও সত্যের দাবি যথেষ্ট বলে আমি এর পূর্ণ সমর্থক।

আলি গওহর

যাকে জানা যায় অবিবেচক বলে' তার কানের কাছে খুব চেঁচিয়ে যদি বলা যায়, তুমি অবিবেচক, তুমি অবিবেচক, তবেই সে সুবিবেচক হয়ে উঠ্‌বে না কি ?

সুজিৎ

সে তার ক্ষমতার উপরে নির্ভর করে। বদ্‌লানো তার দরকার। সে যদি বদলাতে না চায় বা না পারে তাহলে তার সঙ্গে অন্য দলের শক্তি-পরীক্ষা হবে। আর সে শক্তি-পরীক্ষায় তার যে হার হবে তা নিঃসন্দেহ, কেননা বঞ্চিতের দল অনেক বড়।

ধীরেন্দ্রলাল

অর্থাৎ এদেশের হিন্দু-মুসলমান বিরোধেও আপনি দেখছেন যাদের আছে আর যাদের নেই এই দুই দলের মধ্যে সংগ্রাম—রাশিয়ায় যা দেখে এসেছেন। কিন্তু মুসলমানদের সোজা নির্ধন দল ভাবছেন কেমন ক'রে ? বড় লোক মুসলমান ত ভারতবর্ষে দুই একজন নেই !

সুজিৎ

বর্ণ-হিন্দুদের তুলনায় অস্পৃশ্যদের যেমন সহজভাবে নির্ধন বলা যায় মুসলমানদের তেমন ভাবে নির্ধন বলা যায় না সত্য, কিন্তু ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, অস্পৃশ্যদের বিক্ষোভ আর মুসলমানদের বিক্ষোভ মূলতঃ এক জাতীয়। মুসলমানরা এদেশে ছিল শাসক-শ্রেণী, শাসকশ্রেণীর সুখ-সুবিধা তারা রীতিমতই ভোগ করতো। কিন্তু শেষের দিকে তাদের এত অবনতি ঘট্‌লো যে যখন তাদের রাজ্য গেল তখনো তার গুরুত্ব সম্বন্ধে চৈতন্য তাদের হয় নি। তারা দীর্ঘদিন নিরুদ্বেগে কোম্পানী বাহাদুরের অধীনে বড় বড় চাকরি করলে। কিন্তু মুসলমান

রাজত্ব গিয়ে ইংরেজ রাজত্ব যে এদেশে শুরু হয়েছে তা মুসলমানরা ভুলে থাকলেও কাল ভুলে থাকলো না। যখন নিজেদের এই পতন সম্বন্ধে মুসলমানদের চৈতন্য হলো উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় তখন থেকে মোটের উপর তারা হলো বিদ্রোহী। কালে কালে তাদের পূর্ব্ব সমস্ত অধিকার বিলুপ্ত হলো। নতুন রাজার কোনো অনুগ্রহ তারা পেল না বরং নিগ্রহ পেল। ওদিকে হিন্দু তার পুরাতন মনিবের স্থলাভিষিক্ত নতুন মনিবের প্রতি যথেষ্ট আনুগত্য ও অনুরাগ দেখালো। নতুন রাজা যে জ্ঞান ও সভ্যতা নিয়ে এলো তা বুঝবার মতো লোকও তার ঘরে জন্মালো। কাজেই দেশের পূর্ব্বশাসক মুসলমানরা এদেশে নগণ্য হয়ে পড়লো সব দিক থেকেই। মুসলমানের এই দুর্দ্দশা সম্বন্ধে তাঁদের ভিতরে যাঁদের প্রথম চৈতন্য হলো, যেমন বাংলার নবাব আবদুল লতিফ খান বাহাদুর আর উত্তর ভারতের স্যর সৈয়দ আহ্‌মদ খান, তাঁরাও হিন্দুদের মতোই নতুন রাজার অনুগ্রহপ্রার্থী হলেন একটা স্বতন্ত্র দল করে'। তাই যদিও মুসলমানদের অবস্থা অস্পৃশ্যদের মতো অসহায় নয় তবু মুসলমানের অবস্থা একালে হীন হয়ে পড়েছে অন্যপক্ষে হিন্দুর অবস্থার উন্নতি হয়েছে এই দিক দিয়ে তাদের মনোভাব অস্পৃশ্যদের মতোই বঞ্চিতের মনোভাব। এর প্রতিকার না হলে এই বিরোধের মীমাংসা সম্ভবপর নয়।

ধীরেন্দ্রলাল

কিন্তু বর্ণহিন্দুদেরই বা এমন কি অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে! এদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিশেষ ভাবে বর্ণহিন্দুর দল। তাদের দুরবস্থার কথা আজ সবাই জানে।

সুজিৎ

বর্ণহিন্দুদের এই দশা তাদের জন্য অমোঘ নিয়তি। তারা প্রধানতঃ হয়েছিল নতুন প্রভুদের মুৎসুদ্দি। প্রভুদের প্রসাদ কিঞ্চিৎ লাভ হোক

এই হয়েছিল তাদের জীবনের সাধনা। নতুন কর্ত্তাদের ভোগ, কর্ত্তাদের পার্শ্বচর রাজা-মহারাজাদের ভোগ, আর কর্ত্তাদের অনুচর বর্ণহিন্দুদের ভোগ, সবই জুগিয়েছে যারা এদেশের সেই সম্পদস্রষ্টা চাষীদের অবস্থা একটু তলিয়ে বুঝবার অবসর এদের কারো হয়নি। ক্রমবর্দ্ধমান প্রভুদের ও তাঁদের পার্শ্বচরের তুলনায় ক্রমবর্দ্ধমান অনুচরদের ভোগ যথেষ্ট না কমে আর উপায় কি। লোক বাড়ে প্রকৃতির প্রয়োজনে, কিন্তু দেশের সম্পদ বৃদ্ধি নির্ভর করে দেশের লোকেদের সজাগ চেষ্টার উপরে।

গোলাম মওলা

মিষ্টার রায় সমস্যাটি সম্পূর্ণ নূতন চোখে দেখেছেন! বহুদেশের অভিজ্ঞতা না থাকলে এমন করে দেখা সম্ভবপর ছিল না!

বশীরুদ্দিন

সুজিৎবাবু নিজেও বলেছেন তিনি নাস্তিক। কিন্তু এমন ইন্‌সাফ, হক্ বিচার, খোদা-না-মানা পরকাল-না-মানা নাস্তিকের পক্ষে কেমন করে সম্ভব বুঝি না!

আলি গওহর

মওলানা সাহেব সুজিতের কথায় দেখছেন ইন্‌সাফ—আমি কিন্তু দেখ্‌ছি অনুগ্রহ।

সুজিৎ

আমি মানুষের সামান্য সেবক—অনুগ্রহ করবার স্পর্দ্ধা আমাতে কি করে' সম্ভবপর!

আলি গওহর

কথাটা ইচ্ছা করেই একটু চোখা করেছি, শোনো কি বলতে চাচ্ছি। মুসলমানের দুঃখটা তুমি যেভাবে দেখেছ সেটি চমৎকার। কিন্তু বর্ণহিন্দুদের দুঃখটাও ত তোমাকে দেখতে হবে। তাদের প্রতি

তুমি যে এত কঠোর হতে পারছ তার প্রচ্ছন্ন কারণ, তারা তোমার আপনার জন—দুই ছেলেতে বিবাদ হলে বুদ্ধিমান পিতা নিজের ছেলেকে শাসন করেন বেশী। কিন্তু সুজিৎ, এই বিংশ শতাব্দীতে ভারতের হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান, অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ, ভারতবাসী ভিন্ন আর কিছুই নয়। আর কিছু হবার ঝোঁক কাটানো শক্ত। কিন্তু সে-ঝোঁক কাটাতে হবে।

সুজিৎ

হিন্দুকে হিন্দু আর মুসলমানকে মুসলমান থাকবার মতো সুপরামর্শ দেওয়ায় আমার আগ্রহ আছে এ তুমি ভাবতে পারছ কেমন করে!

আলি গওহর

তা ত ভাবছি না। এর ঝোঁক কাটিয়ে ওঠা শক্ত এই বলেছি। এমন ব্যাপার আরো কিছু দিন চলাই স্বাভাবিক। তবে যারা কর্ম্মী, দেশকে শক্তিমন্ত করবার সাধনা যাদের, তাদের হুশিয়ার হতে হবে সব সময়ে, সব বিষয়ে। বর্ণহিন্দুদের ঘাড়ে যত বড় অপরাধের বোঝা তুমি চাপালে তত বড় বোঝা বইবার ক্ষমতা তাদের বাস্তবিকই কি আছে? তারা নতুন প্রভুদের মুৎসুদ্দি হয়েছিল, মিথ্যা নয়, কিন্তু হয়েছিল কেন সে কথাটাও ত ভুললে চলবে না।

সুজিৎ

এদেশের হিন্দুরা নিজেদের জান্‌তো একটি বিজিত সম্প্রদায় বলে', তাদেরই বুদ্ধিমানেরা যদি নিজেদের কিঞ্চিৎ সুখ সুবিধার জন্যে নবাগত প্রভুদের প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগ দেখিয়ে থাকে, বৃহত্তর দেশের ভাল-মন্দের কথা যদি তাদের মনে না পড়ে' থাকে, তবে তাদের পিঠে দু ঘা চাবুক কষবার কথা ভাবা আমার পক্ষে সহজ কিন্তু তাদের অদূরদর্শী দেশদ্রোহী ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করে' ধর্ম্মরোষ প্রকাশ করতে আমার রুচিতে বাধ্‌বে। বর্ণ-হিন্দুদের নিন্দা করার কথা ভাবতে

পারছি তাদের ঘরে দুচারজন লোকের মতো লোক জন্মেছিলেন বলে'। তাঁরা গোটা দেশের কথা ভাবতে চেষ্টা করেছিলেন। কোন্‌টি দেশের লোকদের জন্য পথ আর কোন্‌টি বিপথ সে সম্বন্ধে বহু কথা বলেছিলেন। তাঁদের প্রশংসায় এই বর্ণহিন্দুরা পঞ্চমুখ। নিজেদের পরিচয়ও এরা দেয় তাঁদের উত্তরাধিকারী বলে'। অথচ তাঁদের একটি কথা এরা মানে নি!

ধীরেন্দ্রলাল

কিন্তু বর্ণহিন্দুরা যদি তাদের একালের গুরুদের কথা না-ই মান্‌বে তবে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে আধ শতাব্দী ধরে যুদ্ধ করলে কারা? মুসলমান আর অস্পৃশ্যরা না কি?

সুজিৎ

হিন্দুদের এই আধ শতাব্দী ধরে যুদ্ধ করার পূর্ব্বে মুসলমানরা আধ শতাব্দী ধরে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে লড়েছে ঢাল তলোয়ার নিয়ে—এই ইতিহাসের কথাটা ভুলবেন না। তার পরে তারা হলো বিপর্য্যস্ত। অস্পৃশ্যদের এ যুদ্ধে নামবার কথা ওঠে না—তাদের এত দুর্ব্বল করে' রাখা হয়েছে। তাছাড়া এ যুদ্ধ প্রধানতঃ হয়েছে পাঁয়তারা ভাঁজা ও কিঞ্চিৎ প্যাঁচ কষাকষির যুদ্ধ—যাকে বলে সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। তবে অস্পৃশ্যরা এ যুদ্ধে না নামলেও তাদের কাছাকাছি শ্রেণীর যারা সেই জনসাধারণ এতে শেষ পর্য্যন্ত ভিড়েছে, এ যুদ্ধের গৌরব তাতে বেড়েছে ঢের—দুই চারটা বোমাপিস্তলের আওয়াজের গৌরব তার তুলনায় অনেক কম। কিন্তু কর্ত্তারা এই যুদ্ধ দিয়ে চেয়েছিলেন কোন্ অভিপ্রায় সিদ্ধ করতে তা লুকিয়ে রাখতে পারেন নি। তাঁরা প্রধানতঃ চেয়েছিলেন ইংরেজ প্রভুদের জায়গা দখল করতে। সমাজ-ব্যবস্থা, ধন-ব্যবস্থা, এ সবের বর্ত্তমান কাঠামো তাঁরা বদ্‌লাতে চান নি।

আলি গওহর

চান নি একথা ঠিক বলতে পারা যায় না সুজিৎ। কুঁড়ি ফুল নয় এ কথা সত্য—কিন্তু সে-কথা বলা অনাবশ্যকভাবে নিষ্ঠুর নয় কি?

সুজিৎ

কুঁড়ির কুঁড়িত্ব যদি সনাতন হবার উপক্রম করে তবে গাছ সম্বন্ধে নিষ্ঠুর না হয়ে উপায় কি?

আলি গওহর

আমাদের যুক্তিতর্কের পেছনে থাকে প্রত্যয়, তাকে নাড়া দেওয়া সোজা নয়। দেশের লোকেদের সম্বন্ধে সুজিতের সেই প্রত্যয় কিছু বোঝা যাচ্ছে। তার সেই প্রত্যয়-দুর্গ বোম্‌বার্ড করবার অনুকূল স্থান বৈঠকখানা—খাবার টেবিল নয়। আপনারা গৃহ-স্বামিনীকে ধন্যবাদ জানাবার সুযোগ খুঁজছেন দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে।

ধীরেন্দ্রলাল

নিশ্চয়ই সে-সুযোগ খুঁজছি। তাঁর আপ্যায়ন আর গৃহস্বামীর আলাপ এর কোন্‌টিতে আজ আমাদের বেশী তৃপ্তি হয়েছে বলতে পারবো না।

বশীরুদ্দিন

দুটিতেই আজ গভীর তৃপ্তি পেয়েছি সে কথা আমি বলতে পারি।

সুজিৎ

আলাপে পরিতৃপ্তির সময় এখনো আমার জন্য দূরে। তবে আপ্যায়নে যে তৃপ্তি পেয়েছি তা না বললেও চলে। বহুদিন পরে মোরগ-পোলাওয়ের স্বাদটা নতুন করে মুখে লাগ্‌লো।

হাসিনা

আমার প্রাপ্যের অনেক বেশী আমি পাচ্ছি। বেশী ভারী বোঝা বওয়া দায় সে কথা ভুলবেন না।

গোলাম মওলা

আপনার বোঝার ভার আমি কিছু লাঘব করতে পারি। আমার আজ অসুবিধা হয়েছে একথা আমি সোজা ভাবেই বল্‌বো। উৎকৃষ্ট পোলাও আর উৎকৃষ্ট আলোচনা এ দুয়ের মাঝে পড়ে পোলাওয়ের প্রতি একনিষ্ঠতার শোচনীয় অভাব আমাতে ঘটেছে। এ পাপের প্রায়শ্চিত্তের ভার আপনাদেরই নিতে হবে।

ধীরেন্দ্রলাল

বেশী লোভ করো না মওলা। সাহিত্যিকরা ব্রাহ্মণ জাতীয়—দানে নয় দক্ষিণায় তাঁদের আনন্দ। গওহর সাহেব একবার স্বধর্ম্ম বিস্মৃত হয়েছেন বলে' আবার যে হবেন তা আশা করো না।

তৃতীয় দৃশ্য

[আলি গওহরের বসবার ঘর। আলি গওহর ব্যতীত আর সবাই পান ও সিগারেট খান।]

সুজিৎ

গওহর, তুমি বলেছ দেশের লোকেদের সম্বন্ধে আমার প্রত্যয় খানিকটা বোঝা যাচ্ছে। মিথ্যা নয়, এতদিন যারা দেশের নেতৃত্ব করেছে তাদের শোচনীয় দায়িত্বহীনতা সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাদের করতে হবে। সেইটিই হবে তাদের জন্য আর সমস্ত দেশের জন্য নবজীবন লাভের পথ।

আলি গওহর

বেশ—প্রায়শ্চিত্ত তারা করুক। কিন্তু যজমানের প্রায়শ্চিত্তে পুরোহিতের যে উদরপূর্ত্তির ব্যবস্থা সেটি ত প্রশস্ত ব্যবস্থা নয়। প্রায়শ্চিত্ত যারা করবে তারা সে কথা বুঝুক, যারা প্রায়শ্চিত্ত দেখ্‌তে দাঁড়িয়েছে তাদেরও মনে শ্রদ্ধার অভাব না হোক। তবেই সে প্রায়শ্চিত্ত যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত হতে পারবে—তার ভিতর দিয়ে আস্‌তে পারবে দেশের নবজীবন।

সুজিৎ

তোমার ব্যবস্থা একটু নতুন রকমের হলো না? যারা অন্যায় করেছে তারা নীচে নেমে যাবে, যাদের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে তারা উপরে উঠবে, আর এই ওঠা নামা ভাঙা-গড়ার সময়ে ঈর্ষা নিন্দা কিছু-কাল ফেনাতে থাকবে—এই ত স্বাভাবিক। শ্রদ্ধার কথা এখানে

কেন? পরাজিতের উদ্দেশ্যেও জেতা কখনো কখনো শ্রদ্ধা নিবেদন করে, কিন্তু সে তখন যখন জেতা নিঃসন্দেহে জেতা।

আলি গওহর

তাহলে ভারতেরও মুক্তির পথ শ্রেণী-সংগ্রামের ভিতর দিয়ে আর সে শ্রেণীসংগ্রাম একরকম শুরু হয়েছে—এই তুমি বলতে চাও?

সুজিৎ

শ্রেণীসংগ্রাম যে অবশ্যম্ভাবী সে কথা না বললেও চলে। কিন্তু এদেশে সে-সংগ্রাম শুরু হয়েছে তা ঠিক ভাবছি না। ভাবলে কংগ্রেসে যোগ না দিয়ে কৃষক বা শ্রমিকদের প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতাম।

গোলাম মওলা

কেনই বা তা নয়? কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশেও কৃষক ও শ্রমিকদের অভ্যুত্থান চলেছে। আর মুসলমানদের বিক্ষোভ যে মূলতঃ বঞ্চিতদের বিক্ষোভ তা আর আপনাকে বলবার দরকার করে না। কংগ্রেসের চেষ্টার ভিতর দিয়ে দেশে শক্তির বোধ জেগেছে—সেই শক্তি যোগ্য প্রকাশ-ধারা চাইবেই।

সুজিৎ

নিঃসন্দেহ। কিন্তু শক্তি বা শক্তির বোধ দেশে যা এসেছে তা যৎসামান্য। সেই শক্তির পরিমাণ বাড়াবার সাধনা কংগ্রেসের—সমস্ত দেশের আনুগত্যের সাহায্যে বিদেশী শাসকদের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধ করে', কেননা ভারতের সব চাইতে বড় সমস্যা তার পরাধীনতা।

গোলাম মওলা

দেশের বড় সমস্যা যে পরাধীনতা একথা দেশের সবাই জানে ও মানে। দেশের সবাই কংগ্রেসের পিছনে এতদিন দাঁড়িয়েছিল এই বিশ্বাসে যে কংগ্রেসের সাহায্যে যে শক্তি দেশে আসবে তাতে সকলে উপকৃত হবে। তা না হয়ে যারা আগে থাকৃতে সুবিধা করে নিয়েছে

তারাই যদি আরো সুবিধা করে নেয় আর যারা বঞ্চিত তারা বঞ্চিতই থেকে যায়, তবে দেশের সকলের আনুগত্য কংগ্রেস কেমন করে' দাবি করতে পারে ?

সুজিৎ

আমিও সেই কথাই বলতে চাচ্ছি, তবে কিছু ভিন্ন ভাবে। কংগ্রেস যে তার অনুবর্ত্তী নির্ধনদের ঠকাতে চাচ্ছে আর সম্পন্নদের আরো সম্পন্ন করতে চাচ্ছে তা সত্য নয়। তবে যে-শাসনপদ্ধতির ভার সে নিয়েছে তার ভিতরকার ক্রটির জন্যেই সে যোগ্য ভাবে কাজ করতে পারছে না। অথচ নিরন্তর যুদ্ধ অসঙ্গত ও অসম্ভব। বিশ্রাম চাইই। সেই বিশ্রামের কালে সবশ্রেণীর মনে নতুন নতুন আশার সৃষ্টি করে' তাদের পূর্ণ আনুগত্য লাভের চেষ্টায় তার কোন ক্রটি না হোক, তার যে সব সভ্য কিঞ্চিৎ সম্পন্ন তারা এ কথা বুঝুক, এজন্য বিশেষ চেষ্টা করুক—এইই আমার বক্তব্য।

গোলাম মণ্ডল

যারা সম্পন্ন তারা সে-কথা বুঝছে না, বুঝবার গরজও দেখাচ্ছে না। সেই জন্যই ত বঞ্চিতদের বিক্ষোভ-প্রকাশ অবশ্য কর্ত্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সুজিৎ

বিক্ষোভ যারা প্রকাশ করছে তাদের বিরুদ্ধে আমার একটি কথাও বলবার নেই। আমি তাদের বন্ধু বলেই নিজেকে পরিচিত করতে চাই কংগ্রেসে। তাদের কথা কংগ্রেসকে শুন্তে হবে এই আমার মূল কথা।

বশীরুদ্দিন

যদি আপনার কথা কংগ্রেস না শোনে ?

সুজিৎ

কংগ্রেসের যাঁরা শ্রেষ্ঠ সৈনিক, যাঁদের প্রাণঢালা সাধনায় কংগ্রেস

ভারতের মুখকে জগতের সামনে একটু উজ্জ্বল করেছে তাঁরা এখনো কংগ্রেসের পরিচালক। যা ন্যায়সঙ্গত, কার্য্যকরী, শেষ পর্য্যন্ত তা তাঁরা মানবেন না, বা তার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করবেন না, এ বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না।

গোলাম মওলা

আজকার দিনেও কংগ্রেসের নায়কদের সম্বন্ধে আপনার এতখানি বিশ্বাস কিছু আশ্চর্যজনক নয় কি ?

সুজিৎ

না—ঠিক তা নয়। বিশাল ভারতে কংগ্রেস সংযুক্ত হয়েছে জন-জীবনের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের সঙ্গে—সেই যোগের টান একে রক্ষা করবে সমস্ত অনিবার্য্য বক্রতা থেকে। অবশ্য বাংলায় বসে সে কথা বোঝা কিছু কঠিন।

বশীরুদ্দিন

কেন ?

সুজিৎ

সে উত্তর ত দেওয়া হয়েছে—বাংলার গত একশত বৎসরের ইতিহাসের মধ্যে রয়েছে সেই 'কেন'র উত্তর। বাংলায় এতকাল যাঁরা নেতৃত্ব করেছেন তাঁদের মনে জগা-খিচুড়ি হয়ে গেছে সৃষ্টিধর্ম্মে আর মুৎসুদ্দি ধর্ম্মে, অথচ তা বুঝতে পারা তাঁদের পক্ষে কঠিন হচ্ছে। তাঁদের মনের এই অব্যবস্থা আজ বেসুর বাজাচ্ছে বাংলায় ও বাংলার বাইরে।

ধীরেন্দ্রলাল

বাংলার হিন্দুরা বর্ত্তমানে যত দুঃখ অসুবিধা ভোগ করছে সেজন্যে একমাত্র তাদেরই আপনি দায়ী করতে চান ?

সুজিৎ

না করে উপায় কি। নেতার আসনে যে বসেছিল সে যদি সে

আসনের মর্য্যাদা রক্ষা করতে না পেরে থাকে, আর তার ফলে সম্মানের পরিবর্ত্তে পায় অসম্মান সেজন্যে আর কে দায়ী হবে? "ডিভাইড এণ্ড রুলে"র কথা বা ঈর্ষা-বিদ্বেষের কথা তুলে লাভ নেই যেমন নদীতে সাঁতার দিতে গিয়ে স্রোতের বাধার কথা তুলে লাভ নেই।

ধীরেন্দ্রলাল

আপনার যুক্তি সত্য হলে মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দ্দশার প্রতি এতটুকু সহানুভূতির কথা আপনি বলতে পারেন না কেন না আপনার কবুল মতোই তাদের সম্মান তারা হারিয়েছে নিজেদের দোষে।

সুজিৎ

পারি এই কারণে যে সেটি ছিল অষ্টাদশ শতাব্দী আর এটি বিংশ শতাব্দী। রাজনৈতিক জাতীয়তা ও স্বাধীনতার অর্থ সেদিনের শিক্ষিতেরা যা বুঝতো আজকার শিক্ষিতেরা বুঝতে পারে তার চাইতে অনেক বেশী স্পষ্ট করে'। কিন্তু একালে জন্মেও নিজেদের দায়িত্ব যারা এতদিন বোঝেনি দায়ে ঠেকে আজ তাদের তা বুঝতে হবে। বাংলা দেশ সম্বন্ধে এ শ্রদ্ধা অবশ্য আমার আছে যে, তার নূতন দায়িত্ব সম্বন্ধে সে পুরোপুরি সজাগ হবে শীগগীরই কেন না সে জন্ম-বিপ্লবী।

আলি গওহর

তাহলে আর তুমি শ্রেণীসংগ্রামের উপরে অত জোর দিচ্ছ কেন? তুমি ত বাস্তবিকই চাচ্ছ শাসকদের সঙ্গে সমস্ত দেশের সংগ্রাম।

সুজিৎ

হাঁ তাইই চাচ্ছি। কিন্তু শ্রেণীসংগ্রাম যে সত্য আর অবশ্যম্ভাবী। সেই সত্য আমাদের চোখে পড়ছে। তার কথা ভুল্‌লে চল্‌বে কেন?

আলি গওহর

সত্যকে ভুলতে আমি বলি না। তবে কর্ম্মীর সত্যের বোধ আর

ভাবুকের সত্যের বোধ এ দুয়ের মধ্যে তফাৎ রয়েছে। কর্ম্মীর জন্যে বেশী করে চাই এই মুহূর্ত্তে সত্যের প্রয়োগ কি ধরণের হবে সেই বোধ।

স্থজিৎ

আমি কর্মী—দেশকে আপাততঃ কি করতে হবে সেই কথাই বলতে চাচ্ছি।

আলি গওহর

কিন্তু তোমাকে পুরোপুরি কর্মী হতে বাধা দিচ্ছে তোমার দরদ—সত্যের চাইতে সেই দরদের প্রভাব প্রবলতর বোধ হচ্ছে তোমার মধ্যে।

স্থজিৎ

বুঝিয়ে বল তোমার কথা।

আলি গওহর

এ যুগের ভারতবর্ষের প্রধান প্রয়োজন রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ—সে তোমারও মত। যাঁরা এদেশের শাসক তাঁদের হাত থেকে সেই স্বাধীনতা আদায় করা যাবে বড় রকমের শক্তি-পরীক্ষার ফলে। অস্ত্রধারণের শক্তি ও শিক্ষা আমাদের নেই, কিন্তু সর্ব্বসাধারণ চায় এই স্বাধীনতা এই ইচ্ছা জ্ঞাপন করবার শক্তি আমাদের আছে। দেশের লোকদের সাহায্য ব্যতীত বিদেশী জাতির পক্ষে এদেশ শাসন অসম্ভব, কাজেই দেশের এই সংহত ইচ্ছার সামনে বিদেশী রাজশক্তির আনত না হয়ে উপায় নেই। এই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সব মানুষের পক্ষেই যেমন স্বাভাবিক তেমনি আনন্দকর, তার সঙ্গে মিলেছে আমাদের একালের তীব্র দারিদ্র্য—কাজেই এর সাধনা দুর্জ্জয় হয়ে ওঠার পক্ষে বাধা নেই। নেতা যোগ্য হলে অর্থাৎ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও অভীত হলে, এ প্রয়াসে সফলতা অনিবার্য্য। তাই দেশে কে বঞ্চিত আর কে বঞ্চিত নয় এ চিন্তা আজ অসার্থক—আমি বলবো অসত্য, দেশে আজ সবাই বঞ্চিত-অন্তঃসারশূন্য। এটি সত্য ও সার্থক হবে শাসন-শক্তি দেশের

লোকের হাতে এলে। কিন্তু নানা ঐতিহাসিক কারণে যে-ভেদবুদ্ধির হাত থেকে নিস্তার পাওয়া এদেশের পক্ষে রীতিমত কঠিন সেই ক্ষুদ্রতা ও নির্বুদ্ধিতা তোমার মতো দেশসেবকের স্নেহরসে লালিত হবার সুযোগ পেয়ে দেশের মহত্তর সম্ভাবনার পথ আগ্‌লে দাঁড়াবে মাত্র।

গোলাম মণ্ডল

যে স্বাধীনতা দেশের জন্যে নিঃসন্দেহে কাম্য তা যদি কোনো একটি দলের জন্য সুবিধাজনক হয়, অন্যান্য দলের জন্য না হয়, এমন কি আশঙ্কাজনক হয়, তবে অন্যান্য দলের লোকদের সে স্বাধীনতার জন্য আগ্রহান্বিত না হওয়া অস্বাভাবিক কি ?

আলি গওহর

ভয়ে ভীত হওয়া জীব-ধর্ম্ম, কাজেই মানুষের জন্যও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ভয় যেমন স্বাভাবিক, আশা উদ্যম অভয় এসবও মানুষের জন্য তেমনি অথবা তার চাইতেও বেশী স্বাভাবিক। ভয় যদি কাউকে বেশী করে' পেয়ে বসে থাকে তবে তার অবস্থা কিছু বেশী অস্বাভাবিক।

সুজিৎ

ভয়ের কথা একটা কুতর্ক। ভীত যারা তাদের পরাধীনতার আসক্তি দুশ্ছেদ্য—তাদের কথা আসে না। আমি বলতে চাচ্ছি এই স্বাধীনতা-সংগ্রামে দেশের সর্বশ্রেণীর মনে নূতন করে আশা ও উৎসাহ সঞ্চারের কথা। দেশের প্রধান প্রধান দল হচ্ছে হিন্দুর উচ্চ আর নিম্নবর্ণ আর মুসলমান। একালের রাজনৈতিক চেতনা দেখা দিয়েছে বিশেষ ভাবে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে—নূতন রাজার নূতন অনুগ্রহ যারা বেশি ভোগ করেছে, আজ স্বাধীনতা-সংগ্রামকে সর্বব্যাপী করবার জন্যে তারা এগিয়ে আসুক-এতদিন যারা বঞ্চিত ছিল সেই অস্পৃশ্য ও মুসলমানদের অন্তরে আশা ও উৎসাহের সঞ্চার করতে। এতে তাদের এতটুকু কুণ্ঠা

প্রকাশ না পাক। এইত কাণ্ডজ্ঞানের কথা বলে মনে হয়। দেশের স্বাধীনতা মুসলমানরা আর অস্পৃশ্যরা চায় না এ ভাবাই অন্যায়।

আলি গওহর

একটি কথা বলা হয়নি সুজিৎ। অস্পৃশ্য-সমস্যা আর মুসলমান-সমস্যা যে তুমি এক শ্রেণীর ভাবছ ওতে আমার কিছু আপত্তি আছে। মুসলমান-নেতারাও তা ভাবছেন না। তাঁরা একটা স্বতন্ত্র সংস্কৃতির স্বতন্ত্র জীবনাদর্শের বিশিষ্ট সম্প্রদায় অথবা জাতি এই তাঁরা বলছেন, আর সে-সবের পূর্ণ সংরক্ষণ দাবি করছেন। অস্পৃশ্যদের সমস্যা শুধু অর্থনৈতিক।

সুজিৎ

রাজনৈতিক স্বাধীনতা কি তা দেশ আজো প্রত্যক্ষ করেনি তাই সেই স্বাধীনতার দিনে একালের ধর্ম-সম্প্রদায়গুলোর কার কি চেহারা হবে সে সম্বন্ধে নানা জল্পনা-কল্পনা চলছে। কেউ ভাবছে বৈদিক ঋষিদের তপোবনে ফিরে যাবার কথা, কেউ ভাবছে আবুবকর-ওমরের খেলাফতের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার কথা। বৈজ্ঞানিক চিন্তার ষ্টীম-রোলার ভারতের বিচিত্র আচার ও ধর্ম-মতের উপর দিয়েও চলেছে—এই বুঝে এদের এই সব স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্ন দেখবার অবসর দেওয়া যেতে পারে। গোড়ার কথা দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা আর দেশের সকলের অর্থ-নৈতিক উন্নতি। কর্ম্মীরা যদি সে কথা বোঝেন আর সেই পথে চলতে পারেন তবে ভয় করবার কিছু থাকে না।

আলি গওহর

কিন্তু দেশের সেই রাজনৈতিক স্বাধীনতার আর অর্থনৈতিক উন্নতির কর্ম্মীদল ত আকাশ পথে পড়বে না দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়েই তাদের জন্ম হবে। কিন্তু ম্যাক্‌ডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের মতো নিদারুণ ব্যাপারকে স্বীকার করে তুমি বৃহত্তর দেশে সেই রাজনৈতিক ও

অর্থনৈতিক বোধের বিকাশের পথই ত করছ রুদ্ধ! যে সব সম্প্রদায় কৃপার পাত্র হোলো তাদের দুর্বলতা বোধ হবে সনাতন। সমস্ত দেশের প্রতি তাদের অপরিহার্য দায়িত্ব রয়েছে, সেই দায়িত্ব স্বীকারের ভিতর দিয়েই আসতে পারে সমস্ত দেশের সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও প্রকৃত উন্নতি, মান-মর্যাদা,—নিজেদের সম্বন্ধে এই অতিপ্রয়োজনীয় বাস্তবতা-বোধ তাদের ~ ন্ন হবে বিকৃত

ধীরেন্দ্রলাল

কিন্তু বড়ো বড়ো জাতীয়তাবাদী মুসলিম-নেতাদের পরামর্শেই ত কংগ্রেস এই সম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

আলি গওহর

সেই সব শ্রদ্ধেয় মুসলিম নেতা ও কংগ্রেসের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ নেতা এখানে মারাত্মক ভুল করেছেন—এই কথাই বলতে হচ্ছে। ভুল করবার সৌখীনতার অবকাশ রাজনৈতিক-স্বাধীনতা-যুদ্ধে নেই।

সুজিৎ

কিন্তু রাজনীতি ত চিরপরিবর্তনশীল। আজকার প্রয়োজনে যে ব্যবস্থা প্রশস্ত বিবেচিত হলো কালকার প্রয়োজনে তার পরিবর্তন হবে অপরিহার্য। সেই পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করবে সবাই যদি দেশ প্রকৃত উন্নতির পথে দাঁড়ায়।

আলি গওহর

সেই "যদি" যে এক প্রকাণ্ড যদি সুজিৎ। যাকে বলছ দেশের প্রকৃত উন্নতির পথ তাতে দেশকে দাঁড়-করানই যে আজকার সমস্যা। তুমি সম্পন্ন বর্ণ-হিন্দুদের বলছ দুর্গত মুসলমান আর অস্পৃশ্যদের জন্যে কিছু উদার হতে। কিন্তু যারা দীর্ঘকাল কাটিয়েছে মুখ্যতঃ শাসকশ্রেণীর প্রসাদজীবী হয়ে তারা কি সম্পন্ন! সত্য বটে দেশের একালের শ্রেষ্ঠ সেবকদের জন্ম সেই সমাজে বেশি হয়েছে, কিন্তু তাঁদের প্রভাব সে-

সমাজে কি এতখানি অনুভূত হয়েছে যে এমন উদার হবার শক্তি প্রকৃতই তার অর্জিত হয়েছে ?

সুজিৎ

তা হয়নি সে যথার্থ। কিন্তু উনিশ বিশ বলে কথা আছে। দেশ যে সঙ্কট-স্থানে এসে পৌঁছেচে তাতে একটু অগ্রসর দলকেই এগিয়ে যাবার ভার নিতে হবে। সঙ্কট-স্থানে পৌঁছে তাইই কাজ।

আলি গওহর

হাঁ তাইই কাজ। কিন্তু আমাদের দেশের জন্য সেই এগিয়ে যাবার ভার নেবার দল বর্ণ-হিন্দুর দল নয়, সে-সামর্থ্য তাদের সত্যই নেই—শক্তির বাড়া ভক্তি কাউকে করতে বলা আর তার তাতে রাজি হওয়া দুইই ভয়াবহ। আমাদের দেশের জন্য সেই এগিয়ে যাবার ভার নেবার দলের নাম হচ্ছে দেশ-সন্তানের দল বা ভারত-সন্তানের দল। দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ে তাদের জন্ম হয়েছে, বর্ণহিন্দুর দলে তাদের সংখ্যা আজো কিছু বেশি, তাদের অনেকে নিজেদের বিভিন্ন দলের সন্তান বলে আজো মনে করতে পারে—কিন্তু প্রকৃতই তাদের জন্ম হয়েছে বৃহত্তর জন্মভূমির জঠর থেকে, সেই বৃহত্তর জন্মভূমির প্রতি তাদের স্বাভাবিক অনুরাগে রয়েছে তাদের সত্য কুল-পরিচয়। এই হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান খৃষ্টানের দেশে, এই আর্য অনার্য পাঠান মোগলের দেশে, এমন কি বাঙালী মারাঠী পাঞ্জাবী মাদ্রাজীর দেশে ভারতসন্তান-দলের জন্ম কেমন করে' সম্ভবপর হলো সে এক রহস্য-ময় ব্যাপার। কিন্তু জন্ম যে হয়েছে তা সত্য। তাদের আবির্ভাব শুধু তাদের জন্মভূমিতে নয় জগতে অনুভূত হয়েছে। এই বিরাট মৃত ও অর্ধমৃতের দেশে তারাই কেবল জীবিত—জীবিতের ধর্ম যে বিকাশ, বিকাশের নব নব আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাদের মধ্যেই তা বিদ্যমান। তাদের পূর্ণ বিকাশ অব্যাহত হোক, কোনো মুমূর্ষুর অন্তিম প্রলাপে তার ধার

ক্ষুণ্ণ না হোক—এইই সমস্ত দেশের বেঁচে উঠবার একমাত্র উপায়। এ ভিন্ন অন্য পথ নেই। স্তূপাকার ভস্মের মধ্যে যত্নের যোগ্য কেবল স্ফুলিঙ্গ।

গোলাম মণ্ডল।

এই মুমূর্ষু ও ভস্ম কারা ?

আলি গওহর

যাদের বাঁচবার শক্তি নিঃশেষিত হয়েছে তারাই। মানুষ এমন অনেক মত-বিশ্বাস আচার-পদ্ধতি শঙ্কা-সন্দেহ বহন ক'রে চলে কাল-ধর্ম্মে যা তার জীবনকে আর শক্তিমন্ত করতে পারে না। সে-সবের প্রতি তার মমতা যখন হয়ে ওঠে দুশ্ছেদ্য তখন প্রকাশ পায় তার মুমূর্ষুতা। এমন মৃত্যু চিরদিন জগতে ঘট্‌ছে।

সুজিৎ

কিন্তু গওহর, এক জায়গায় তুমি একটা বড় রকমের ভুল করছ না! তুমি যা বলছ সে-সব আজ যাঁরা আমাদের দেশে নেতৃত্ব করবেন একান্ত-ভাবে তাঁদের মনোভাবের দিকে দৃষ্টি রেখে। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জন-নেতৃত্ব কিছু অদ্ভুত ব্যাপার। সেখানে নেতার শুধু নিজের উদ্দেশ্য আদর্শ সম্বন্ধে সজাগ হলেই চল্‌বে না, তাঁর জানা চাই জনসাধারণের স্তরে অবলীলাক্রমে নেমে আসার কৌশল—তাদের ভাষায় কথা কইবার ক্ষমতা। আমাদের দেশে সেই জনসাধারণ আজো হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান শিখ। সে ক্ষেত্রে দেশের রাজনৈতিক নবজন্মের কথা তুমি যা বলছ তা যত মূল্যবানই হোক তোমার ভাবা তারা বুঝবে কি? অথচ জন-সাধারণকে সঙ্গে না পেলে রাজনৈতিক নেতা কৃপার পাত্র ভিন্ন আর কিছুই নয়।

আলি গওহর

রাজনৈতিক নেতৃত্বের যে বর্ণনা তুমি দিলে তাকে অসার্থক না বললেও চলে। কিন্তু এমন সময় দেশ বা জাতির জীবনে আসে যখন

তার রাজনীতি এই প্রচলিত অর্থের রাজনীতি আর থাকে না, তা বাস্তবিকই হয়ে ওঠে তার জন্য ব্যাপক জীবন-নীতি—রাজনীতি অর্থনীতি ধর্ম্ম দর্শন সব সংহৃত হয় তার মধ্যে। ভারতের এই যুগের রাজনীতি সেই রাজনীতি—নব জীবন-সৃষ্টির আয়োজন—এ কথা ভুলো না। তুমি বলছ ব্যাপারটি জটিল, জন-সাধারণ বুঝবে না। সৃষ্টি মাত্রই জটিল। কিন্তু সৃষ্টি যখন হয় তখন তাকে যেমন মানুষ বোঝে এমন আর কিছুই বোঝে না, কেননা সৃষ্টি হয় বহুর প্রয়োজনে, বহুদিনের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সাধনায়—যাঁরা সেই সৃষ্টি করেন, বা যাঁদের ভিতর দিয়ে সেই সৃষ্টি হয় তাঁরা উপলক্ষ মাত্র। আমাদের দেশের জনসাধারণও দেশের এই নব-জন্মের অকুণ্ঠিত জয় ঘোষণা করছে এর প্রতি তাদের অকৃত্রিম আনুগত্য দেখিয়ে। জনসাধারণকে অবুঝ শিশু মনে করা আমাদের দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর এক মহা ভুল—এ ভুল তাঁদের হয় জনসাধারণের সঙ্গে তাঁরা দীর্ঘদিন সম্মিলিত জীবন যাপন করেন নি বলেই। মানুষের জন্য যা শ্রেষ্ঠ সত্য তা সূর্য্যের আলোর মতো—অপূর্ব তার সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হবার সর্ব্বত্র আলোকিত করবার ক্ষমতা। যা সমস্ত জীবন্মৃত দেশের জন্য এনেছে বল-বিক্রম আর অফুরন্ত আশা সেই পরম সত্যকে দেশের মানুষ বুঝবে না তবে বুঝবে কি? সত্যের বিরোধিতা মানুষের সমাজে নূতন নয়; কিন্তু এমনি তার প্রভাব যে বিরোধিতা করতে করতেই মানুষ হয় তার অনুবর্ত্তী। একটা নূতন সত্যের নূতন জীবনের স্বাদ দেশ পেয়েছে তার নব জাতীয়তা-বোধ থেকে—আমাদের একালের রাজনীতি সম্বন্ধে এই মূল কথা। এই সত্যের আনুগত্যে এতটুকু শিথিলতা আজ আমাদের মধ্যে প্রকাশ না পাক।

গোলাম মণ্ডল

তাহলে আমাদের দেশের রাজনীতিকে আপনি প্রকারান্তে বলতে চাচ্ছেন একটা নূতন ধর্ম্মসাধনার মতো ব্যাপার।

আলি গওহর

আমি বলবার কে—তাইই যে সত্য।

গোলাম মণ্ডল

কিন্তু যাঁরা এতে নেতৃত্ব করছেন তাঁরা ঠিক একথা বলছেন না।

আলি গওহর

ধর্ম্মের উপরে এত ফুল-চন্দন চাপানো হয়েছে যে তার প্রকৃত রূপ আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। ধর্ম্ম আকাশ থেকে নেমে এসেছে এ যতখানি সত্য তার চাইতে অনেক বেশী সত্য—মর্ত্ত্যের হৃদয়-কন্দর থেকে তার জন্ম হয়েছে। চারপাশের জীবনের দুর্গতি সুগতি হতে চেয়েছে সর্ব্ব প্রযত্নে—এইই ধর্ম্মের চিরন্তন রূপ। এ রূপ ভারতের এযুগের স্বরাজ-সাধনায় সম্পূর্ণ অনাবৃত। মানুষের ভাষার ক্রমাগত বদল হচ্ছে জীবনের প্রয়োজনে, আমাদের একালের রাজনৈতিক নেতারা তাই সেকালের ধর্ম্মের ভাষায় কথা বলেন না। তাছাড়া পূর্ব্বের সঙ্গে পরের সম্বন্ধের কথা ভেবে দেখবার অবসরও তাঁদের অনেকের নেই।

গোলাম মণ্ডল

আপনার কথা যদি সত্য হয় তবে স্বরাজ-সাধনার আয়ু এদেশে দীর্ঘ হবে মনে হয় না। পূর্ব্বপুরুষের ধর্ম্ম এদেশের লোকে ছাড়বে এ আশা করা অত্যন্ত কঠিন।

আলি গওহর

কঠিন ত বটেই। শুধু এ দেশে কেন কোনো দেশেই পূর্ব্ব পুরুষের ধর্ম্ম বা আচার লোকে সহজে ছাড়ে নি। ছাড়বার সত্যকার কারণ যখন ঘটেছে তখনই ছেড়েছে। এদেশেও সে কারণ ঘটেছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যে বিচ্ছিন্ন জীবন এতদিন এদেশের লোকে যাপন করেছে তার চাইতে মহত্তর জীবনের সম্ভাবনা তারা আজ দেখছে। ওদিকে সর্ব্বজয়ী বিজ্ঞান জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে ক্রমাগত

তাদের তাগিদ দিচ্ছে মৃত্যুর পরে পরকালের দিকে চেয়ে থাকবার জন্যে নয় ইহকালের জীবনে প্রতিদিনের উৎকর্ষ সম্বন্ধে সচেতন হতে। দগদগে আগুনে পড়ে লোহাও হয় আগুন। মানুষের অনন্ত সম্ভাবনা। শুধু দেখা দরকার যা সে ছিল তার চাইতে যা হতে যাচ্ছে তা উৎকৃষ্টতর কি না।

ধীরেন্দ্রলাল

কিন্তু এ যে কঠিন সমস্যা গওহর সাহেব! এর মীমাংসা করবেন কেমন করে! ভগবদ্‌ভক্ত কবীর ভগবৎ-সঙ্গীত গাচ্ছেন আর তাঁত বুনছেন আর স্বদেশভক্ত হিট্‌লার তাঁর স্বদেশবাসীদের করতে চাচ্ছেন জগতে অজেয় আর প্রয়োজন মতো পরপীড়ন করছেন—এর কোন্‌টিকে বলবেন উৎকৃষ্টতর!

আলি গওহর

জীবনে সমস্যা যত কঠিন হয়ে দেখা দেয় তার চাইতেও তাকে কঠিন করে তোলায় বিদ্বানদের আনন্দ। কিন্তু সমস্যা যত কঠিনই হোক জীবন তার উত্তর দেয়—তাতেই জীবনের জীবিতত্ব। কবীর আর হিট্‌লার জগতে চিরদিনই আছে। সময় সময় এদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিশ্চিহ্ন হয় এক ব্যক্তিত্বে—যেমন কৃষ্ণে বা মোহম্মদে। কবীর আর হিট্‌লার দুজনেই জীবনের সেবক, সেজন্যে জীবনের সমাদর দুজনেই পায়। আবার দুজনেই সে-গৌরব থেকে বঞ্চিত হতে পারে সহজে—কবীর হতে পারে খোল-করতাল-বাজিয়ে বৈরাগী, হিট্‌লার হতে পারে কাণ্ডজ্ঞানহীন নরঘাতক। জীবন চায় বিকাশ যার অন্য নাম শক্তিলাভ ও সামঞ্জস্য-লাভ ব্যক্তিগতজীবনে ও সমষ্টিগত জীবনে। এই পথে কতদূর চলা যায় আজো তা জানা যায়নি। এই চলার নামই উন্নতি।

ধীরেন্দ্রলাল

তবু প্রশ্নটা রয়েই যাচ্ছে। চলছি এটা বোঝা যায়—কিন্তু উন্নতির

দিকে না অবনতির দিকে সে কথা বোঝা খুব সোজা নয়। ব্যক্তিগত জীবনের কথা থাকুক, যাকে সমষ্টিগত জীবন বলছেন সে ক্ষেত্রে একটি ভুল পাদক্ষেপের গুরুত্ব বুঝতে সময়ে এক শ বছরও যথেষ্ট নয়।

আলি গওহর

নির্ভুল হবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে মানুষ বুঝেছে ভুল তার নিত্যসঙ্গী—তাকে ত্যাগ করবার উপায় নেই। ভুলকে নিয়েই জীবনে এগোতে হয়। নির্ভুল হবার চেষ্টায় কিছুমাত্র গলদ তার না থাকুক—এই মানুষের জন্য দেখবার। এ পরীক্ষায় যে উত্তীর্ণ হয়েছে সে চলেছে জয়যাত্রার পথেই। স্রোতের জল ঘোলা, কিন্তু সেটি তার জন্য অপবাদ নয়।

সুর্জিৎ

আরো একটা বড় ব্যাপার আছে গওহর। মানুষ দেহধারী, তার চিন্তা-ভাবনা রুচি-অরুচি এসবও দেহধারী—সময় সময় উৎকট রকমে। এদেশে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই চিন্তা-ভাবনা রুচি-অরুচি এমন রূপ গ্রহণ করেছে যে একটিকে অপরটি বলে' ভ্রম হবার সম্ভাবনা নেই। হিন্দুর পরিচয় তার প্রতিমা-পূজায়, জাতি-ভেদে, অস্পৃশ্যতায়, গো-বধে আতঙ্কে, টিকিতে, নামাবলীতে, শাঁখা-সিঁদুরে; আর মুসলমানের পরিচয় তার প্রতিমা-পূজার আতঙ্কে অথচ নিজেদের ধর্ম্মপ্রচারে প্রবল আসক্তিতে, গো-বধে বিশ্বাসে, টুপিতে, দাড়িতে, লুঙ্গিতে, পা-জামায়। হিন্দু-আদর্শ মুসলিম-আদর্শ হিন্দু-সংস্কৃতি মুসলিম-সংস্কৃতি এই সব গাল-ভারী কথার অর্থও এই—এই আচারের মোহ। এ মোহ আমাদের দেশে যে কত প্রবল তার স্পষ্ট পরিচয় রয়েছে আমাদের একালের নমস্য নেতাদের জীবনেও। অবারিত জ্ঞান, পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্ব, এ সবের প্রতি তাঁদের অনুরাগের অকৃত্রিমতায় সন্দেহ প্রকাশ করবার অবকাশ নেই, অথচ সেই সঙ্গে রয়েছে প্রাচীন মত-বিশ্বাসের প্রতি তাঁদের অহেতুক

মোহ। তার ফল এই হয়েছে যে যে-পূর্ণাঙ্গ শক্তিমন্ত জাগতিক জীবন আমাদের দেশের জন্য একালে আমরা সবাই কামনা করছি তার দেখা পুরোপুরি মিলছে না; তার পরিবর্ত্তে বরং আজো প্রবলপ্রতাপ হয়ে আছে প্রাচীন ধারার পুনরুজ্জীবনের সৌখীনতা। সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমান যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না তার বড় কারণ রয়েছে এইখানে—এই দিক দিয়ে দেখে সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমান সহজেই সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর জাতীয়তা-বাদকে সন্দেহ করছে প্রাচীন হিন্দুত্বের পুনরুজ্জীবন-বাদ বলে। এই হলো একালে দেশের মহা সঙ্কট। এর থেকে উদ্ধারের পথ আমি এই ভাবতে পেরেছি যে সংখ্যা-গরিষ্ঠ হিন্দু তার নিজের এই দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে পুরোপুরি সচেতন হোক, আর সচেতন হয়ে মুসলমানের দুর্ব্বলতাকে সহ্য করুক। তাদের এই আত্ম-অনুসন্ধান ও পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা হোক আজ দেশের সব চাইতে বড় কাজ—দেশের যে প্রধান রাজনৈতিক লক্ষ্য তার চাইতেও—যেমন স্নায়ুরোগে যারা ভুগছে তাদের জন্য জাগরণের চাইতে নিদ্রা বড় কাজ। মনে হতে পারে, দেশ এতে পিছিয়ে যাবে। কিন্তু তা সত্য নয়। সুযোগ ও সুবিধা মানুষের জন্য বারবার আসে। এমন একটা বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার ভাব যদি দেশের সব সমাজে জাগে তবে এর পরই দেশের রাজনৈতিক লক্ষ্য স্পষ্ট করে তুলবার সুযোগ যখন আসবে তখন শ্রদ্ধা ও প্রীতির মন্ত্রে দীক্ষিত দেশ দেখ্‌তে দেখ্‌তে সিদ্ধিলাভের পথে দাঁড়াবে।

ধীরেন্দ্রলাল

আপনার কথা বোঝা কঠিন নয়। আপনি সর্ব্বপ্রথমে চাচ্ছেন হিন্দুমুসলমানে মিলন। এর জন্য যে কোনো মূল্য দিতে রাজি আছেন কেননা বিশ্বাস করছেন এর ফল ভাল ভিন্ন আর কিছুই হতে পারে না। আপনার এ কথা অশ্রদ্ধেয় নয় আদৌ। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে—মিলন

হয় দুই পক্ষের গরজে, অবশ্য গরজের মাত্রায় কমবেশ হতে পারে। কিন্তু মুসলমানের পক্ষে তেমন গরজের অস্তিত্বই যে ভাল করে' বোঝা যাচ্ছে না।

গোলাম মওলা

তাহলে আপনি বলতে চান, মুসলমানরা দেশের স্বাধীনতা চায় না?

ধীরেন্দ্রলাল

স্বাধীনতা এমন জিনিস যে কেউই তা না চেয়ে পারে না। কিন্তু চাওয়া নানা রকমের। তার মধ্যে কতকগুলো না-চাওয়ার শ্রেণীতে ফেলবার যোগ্য। মুসলমানরা দেশের স্বাধীনতা যতখানি চাচ্ছেন নিজেদের ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভয় করছেন তার চাইতে অনেক বেশী। এ আর তুমি অস্বীকার করবে কেমন করে। অবশ্য সাধারণ ভাবে আমি এ কথা বলছি। সাধারণ ভাবে ভিন্ন গওহর সাহেবকে সামনে রেখে এ কথা বলাই যায় না।

আলি গওহর

তোমার সঙ্গে এই বড় মত-বিরোধ আমার হচ্ছে, সুজিৎ, যে হিন্দু-সমাজকে আমি যতখানি দুর্ব্বল মনে করছি তুমি তা করছ না, সেজন্যে দেশের জন্য নব নব দুঃখ-বরণের ক্ষমতা তুমি তাতে দেখছ। তেমনি তোমার সঙ্গে আর একটা বড় মত-বিরোধ আমার হচ্ছে যে মুসলমান-সমাজকে তুমি যতখানি দুর্ব্বল মনে করছ আমি তা করছি না। মুসলমান এদেশে বিজয়ীর বেশে এসেছিল সেই দুঃখকর স্মৃতির চাইতে তার বড় পরিচয় এই যে সে এদেশকে ভাল বেসেছিল। তার রক্ত এদেশের রক্তের সঙ্গে মিশেছে, তার সর্ব্বস্ব দিয়ে এদেশকে সে সাজিয়েছে। সেই প্রেমিক মুসলমানদল এদেশে নির্ব্বংশ হয়েছে এ আশঙ্কা মনে স্থান দিও না সুজিৎ। প্রেম নির্ব্বংশ হয় না, বরং আশ্চর্য্য তার বংশ বিস্তারের ক্ষমতা। কিন্তু থাকুক এ সব কথা। যে-প্রীতির ও শ্রদ্ধা-চর্চ্চার

কথা তুমি বললে তা কি বাস্তবিকই সম্ভব হিন্দু আর মুসলমান ব্যাপকভাবে এই দুই সমাজের মধ্যে? তুমি যেদিনে সমৃদ্ধ সেদিনে মহাসমাদরে তোমার গৃহে আহ্বান করতে পার তোমার চারপাশের প্রতিবেশীদের। কিন্তু দেশের কোনো সমাজকেই কি তুমি সমৃদ্ধ বলতে পারো? কালের শাসনে সবাই ত দিশাহারা। বহুকালের জীর্ণ আশ্রয় চারদিক থেকে ভেঙে ভেঙে পড়ছে—সম্প্রদায় হিসাবে এই ত তাদের প্রত্যেকের স্বরূপ! সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মিলনের কথা সেই জন্যই ভাবা যায় না। দুজনেই যখন ডুবছে তখন কে কার হাত ধরবে! তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়াতে পারে যে ডুবছে না কেবল সেই। সেই নব জীবনে জীবিত শক্তিমানের নাম ভারত-সন্তান। তাদের সংখ্যা কম দেখে ভয় পেয়ো না। তারা বিপুল সংখ্যায় জন্মাচ্ছে দেশের সর্ব্বত্র—সব সমাজে। তাদের স্বাস্থ্যময় বিকাশের অনুকূল আলো-বাতাসের আর অকৃত্রিম পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব না হোক আজ এই কেবল দেখবার।

সুজিৎ

সম্প্রদায়গুলো এদেশে ভেঙে ভেঙে পড়ছে মিথ্যা নয়। কিন্তু পুরোপুরি যেদিন তারা অকেজো হয়ে যাবে সেদিন ত এখনো দূরে। ততদিন তাদের থেকে যতটুকু কাজ আদায় করা যায় তাও ফেলবার নয়। ভারত-সন্তানদের স্বাস্থ্যময় বিকাশের জন্য ভেবো না। যথাসময়ে তারা আবির্ভূত হবে শক্তি সামর্থ্য নিয়ে। তাদের প্রতীক্ষায় আমিও আছি।

আলি গওহর

ভারত-সন্তানদের সম্বন্ধে কিন্তু অতখানি নিরুদ্বিগ্ন হওয়া যায় না যেমন প্রসূতি ভগ্নস্বাস্থ্য হলে শিশু সম্বন্ধে নিরুদ্বিগ্ন হওয়া যায় না। শিশু অবশ্য বাঁচে বাড়ে তার নিজের জীবনী শক্তিতে, কিন্তু পরিবেশকেও করতে হয়

তার অনুকূল। এদেশের হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধ যত জটিল তত জটিল তুমি ভাবছ না।

সুজিৎ

বেশ— বুঝতে দাও সেই জটিলতা।

আলি গওহর

তুমি বলেছ এদেশে মুসলমানদের তাদের শাসনকালের শেষের দিকে এত অবনতি ঘটেছিল যে কখন যে তাদের রাজ্য গেল সে-চৈতন্য তাদের হলো না বহুকাল পর্য্যন্ত। প্রভুত্ব-গর্ব্বের এমন পরিণতি চিরন্তন, তবু প্রভুত্ব-গর্ব্ব মরতে চায় না—এই হলো এদেশের হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা সম্বন্ধে প্রথম কথা। মুসলমান ছিল শাসক হিন্দু ছিল শাসিত। শাসকের পদ হারিয়ে সে যখন নেমে এল শাসিতের পর্য্যায়ে তখন তার অবস্থা হলো সওয়ার ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেলে যা হয় অর্থাৎ ঘোড়ার পায়ের নীচে পড়বার সম্ভাবনা হয় তার জন্য প্রায় অনিবার্য্য—এই হলো এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা। মানুষ কি ব্যক্তিগত জীবনে কি সমাজগত জীবনে নিয়তই পরিবর্ত্তনের অধীন। কখনো কখনো সেই পরিবর্ত্তন হয় বড় রকমের—এ কূল থেকে ওকূলে পাড়ি দেবার মতো। সেই পাড়ি দেবার সাহস সে পায় প্রধানতঃ তারই পরমাত্মীয় কোনো শক্তিধরের কণ্ঠ থেকে। ইতিহাসে তাঁদের নানা নাম—সমাজ-সংস্কারক, ধর্ম্ম-সংস্কারক, রাষ্ট্রনায়ক, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, ইত্যাদি। সেই শক্তিমান পরমাত্মীয়ের অভয়কণ্ঠের সঙ্গে মুসলমানের শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহজ যোগ আজো ঘটেনি—এই হলো এ সম্বন্ধে তৃতীয় কথা। হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ব্যাপারে একালের অর্থনৈতিক কারণের কথা তুমি যা বলেছ তার সঙ্গে মনে রাখতে হবে এই তিনটি কারণ বা কারণ শ্রেণীর কথা। আরও মনে রাখতে হবে—দেশের মানসক্ষেত্র যে গহন-অরণ্যে পরিণত হয়েছে তার ভিতর দিয়ে রাজপথ তৈরি না হলে তার ভীষণতা ঘুচবার উপায় নেই।

গোলাম মণ্ডল

সওয়ার ত ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেছে—এখন ঘোড়ার পায়ের নীচে রীতিমত দলিত হওয়া ভিন্ন বোধ হয় তার গত্যন্তর নেই !

আলি গওহর

সওয়ারের জ্ঞান যদি লোপ না পায় তবে বিপদ কাটিয়ে ওঠা তার পক্ষে অসম্ভব না হবারই কথা। কিন্তু ভাগ্য তার জন্য দুঃখ বয়ে এনেছে এ কথা পুরোপুরি না বুঝলে তার চলবে কেন?—অবশ্য ভাগ্যের অন্য-নাম কর্ম্মফল। ভারতের মুসলমান শুধু আকবরের নয় সুলতান মামুদের-ও অধস্তন পুরুষ এসব কথার বিন্দুবিসর্গও মনে স্থান না দিয়ে যখন তারা বলে, হিন্দুদের জন্যই তাদের যত দুর্গতি, তখন আমার বিস্ময়ের অবধি থাকে না। তখন নিঃসন্দেহে বুঝি, সত্যাশ্রয়ী নেতার নেতৃত্বলাভের সৌভাগ্য আজো তাদের জন্য ঘটেনি—ভাগ্য আজো তাদের জন্য কুটিল-গতি।

সুজিৎ

এদেশের মুসলমানদের দুর্গতির কারণ-পরম্পরা যাইই হোক আজকার দিনে তাদের বড় দুর্গতি হচ্ছে অর্থনৈতিক দুর্গতি একথা তুমি কেমন করে অস্বীকার করতে পার !

আলি গওহর

স্বীকার করতে খুবই লোভ হয়। কিন্তু নেতার অভাবই ভারতীয় মুসলমানদেরও দুর্গতির সব চাইতে বড় কারণ। মানুষের সব চাইতে বড় শক্তি তার ইচ্ছা-শক্তি—অর্থ আর মোক্ষ তার অধীন। নেতা সেই ইচ্ছার সংহত রূপ।

সুজিৎ

তাহলে ত এদেশকে বসে থাকতে হবে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য। কেননা এদেশের মুসলমান-সমাজ একটা উপেক্ষা করবার মতো সমাজ

নয়। কবে সে সমাজে নব নেতার আবির্ভাব ঘটবে, আর তার ফলে নতুন পথে চলতে তার দ্বিধা-সন্দেহ কেটে যাবে তার কিছুই ঠিক ঠিকানা নেই।

আলি গওহর

না-ব্যাপারটা অত ঘোরালো নয়। মুসলমান—সমাজে পুরোপুরি না হলেও বৃহত্তর দেশে নব-নেতার আত্মপ্রকাশ ও শ্রদ্ধালাভ দুইই ঘটেছে —সেই শ্রদ্ধা অকুণ্ঠিত হোক। অন্য কথায়, সেই নেতাদের মধ্যে জীবনের যে মহত্তর সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে বৃহত্তর দেশে তা প্রকৃতই কাম্য হোক। সেটি কল্যাণকর হবে ব্যাপকভাবে মুসলমান-সমাজেরও জন্য। শুধু ব্যাধিই সংক্রামক নয় স্বাস্থ্যও সংক্রামক। আর-সকলের মতো নেতাও শিশু হয়ে জন্মান আর দিনে দিনে বাড়েন অনুকূল আবহাওয়ায়।

সুজিৎ

সে-আশায় যে আশান্বিত হওয়া যায় না এই ত দুঃখ। আমাদের দেশের সেই সব নেতাই যে খুঁতো—সেকেলেপণা তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট।

আলি গওহর

খনি থেকে যে সোনা পাওয়া যায় তাতে খাদ যথেষ্ট। তবু মানুষের কাছে তার সমাদরের অন্ত নেই কেন না মানুষ জানে সোনা পাওয়া যায় খনি থেকেই।

সুজিৎ

এঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা যে নেই তা মনে করো না। এঁদের ভিতর দিয়েই যে আমাদের দেশে নব-জীবন ও নব যুগ এসেছে তা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করি। কিন্তু সেই নবযুগ যে পুরোপুরি নবযুগ হচ্ছে না এই ত দুঃখ।

আলি গওহর

যা হয়নি তাতেও দুঃখিত না হয়ে চলে যদি হবার সম্ভাবনা থাকে। সাধারণতঃ দীর্ঘ শৈশব তার যার পরিণতি মহৎ।

ধীরেন্দ্রলাল

অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ শৈশব মহৎ পরিণতির দিকে না গিয়ে ঝরে' পড়ার দিকে যায় এও দেখা যায়। আপনি যে সমস্ত দেশের জন্য এক-জাতীয়তার ও কতকটা এক ধর্ম্মের সম্ভাবনার কথা ভাবছেন সেটি অনেকেরই ভাবনার বিষয় হয়েছে এর পূর্ব্বে। বৌদ্ধযুগে যদি না যেতে চান তবে আকবরের যুগ থেকে এ সম্ভাবনার আয়ু গণনা করতে পারেন। অথচ আজো আপনি এটিকে বলছেন সম্ভাবনা, আর আমরা ভাবছি—ওর আশা ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

সুজিৎ

দেশের বর্ত্তমান সঙ্কট সম্বন্ধে আপনার মতটা ভাল করে জানা হয়নি ধীরেনবাবু।

ধীরেন্দ্রলাল

আপনাকে যত ভয়ঙ্কর মনে করেছিলাম দেখছি আপনি ঠিক তা নন। আপনার মতের সঙ্গে আমার মতের অনেক মিল। এক-জাতীয়তাই কাম্য সন্দেহ নেই, কিন্তু আপাততঃ তা যখন সম্ভবপর নয় তখন সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সহযোগিতার পরিমাণ বাড়াবার চেষ্টা করা যেতে পারে একটা আপোষ-নিষ্পত্তিতে পৌঁছে। তাতে কাজ হবে আশা করা যায়।

বশীরুদ্দিন

তাহলে ত সুজিৎ বাবুর সঙ্গে আপনার মতের পূরো মিলই দেখা যাচ্ছে।

গোলাম মণ্ডলা

দেখা গেলেও তফাৎটা বোধ হয় এই যে ওঁর বিবেচনায় সুজিৎবাবু মুসলমানদের ভাগটা অসঙ্গত রকমে মোটা ক'রে দিচ্ছেন।

ধীরেন্দ্রলাল

চিমটি কাটতে মণ্ডলা ওস্তাদ হয়ে উঠেছে। তবে কথাটা মিথ্যা বলে নি। যে ব্যবস্থা ন্যায়সঙ্গত নয় তাকে সমর্থন করা যায় না।

সুজিৎ

নতুন রাজার অধীনে হিন্দুরা, অর্থাৎ বর্ণ-হিন্দুরা, নানা সুখ-সুবিধা ভোগ করেছে দীর্ঘ দিন। তখন ন্যায়ের কথা তোলা হয় নি।

ধীরেন্দ্রলাল

কারণ সোজা। আর কেউ তখন অধিকার দাবি করে নি।

সুজিৎ

করে নি তা পুরোপুরি সত্য নয়। তবে হিন্দুদের দিয়েই নতুন রাজার কাজ হয়েছিল। তাই তাদের প্রতি আদর দেখানো হয়েছিল।

ধীরেন্দ্রলাল

তবেই দেখুন ন্যায় অন্যায়ের কথা সেদিন ঠিক ওঠেনি।

গোলাম মণ্ডলা

সেদিন যদি ন্যায় অন্যায়ের কথা না উঠে থাকে তবে আজও উঠছে না। সেদিন রাজার অনুগ্রহ হয়েছিল হিন্দুর প্রতি, আজ তেমনি হয়েছে মুসলমানের প্রতি, এতে আপনাদের আদৌ বেজার হওয়া সাজে না ধীরেনবাবু। এই মহতী দেবতার প্রতি আপনাদের ভক্তি ত চির-প্রসিদ্ধ।

ধীরেন্দ্রলাল

আমাদের সে ভক্তি সেকেলে। একালে তোমাদের ভক্তির সঙ্গে তুলনায় তা বারীশের কাছে বারিবিন্দুর মতোই তুচ্ছ। কিন্তু সে-তর্ক

থাকুক। আসল কথা এই যে তখন রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে দেশের লোক সজাগ ছিল না, এখন সজাগ হয়েছে। তাই রাজনৈতিক অধিকারের ভাগ-বাঁটোয়ারা ন্যায়সঙ্গত না হলে চলবে না কিছুতেই।

স্থজিৎ

হিন্দুরা মুসলমানদের তুলনায় কিছু অগ্রসর। যে সব সুখ-সুবিধা মুসলমানেরা আজ দাবি করছে তা তারা ভোগ করেছে—সে সব বাস্তবিকই নগণ্য। দেশের বড় লাভের আশায় এই ছোট ক্ষতি তারা সহ্য করতে পারবে না?

ধীরেন্দ্রলাল

কেমন করে' পারবে বলুন। হিন্দুরা যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করেছে বলেই তো আজ রাজনৈতিক অধিকারের প্রশ্ন দেশে উঠেছে। আর কত তাদের কাছ থেকে আশা করবেন? তা ছাড়া এই ক্ষতি স্বীকার কতদিন ধরে' করতে হবে তার কিছুই নিশ্চয়তা নেই। আপনিও সে প্রশ্ন তুলতে চান না।

স্থজিৎ

তুলতে চাই না যথার্থ। তুললে যে-মিলন কামনা করা হচ্ছে তা মর্য্যাদাশূন্য হয়। কিন্তু না তোলার অর্থ কত তা আপনি ভাবছেন না। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের এই প্রীতি দূর করে' দিতে পারবে সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের মনের সব দ্বিধা সন্দেহ ভয়। এত বড় লাভে সব ক্ষতি পুষিয়ে যাবে না কি?

ধীরেন্দ্রলাল

নিশ্চয় করে বলা যায় না। এ রকম চেষ্টার ফল এ পর্যন্ত যা হয়েছে তা নৈরাশ্যজনকই বেশী। হিন্দুর সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হতে মুসলমানের যেন মজ্জাগত আপত্তি। মৈত্রী-কামী আকবর-দারাশুকোর দল মৈত্রী-বিরোধী আওরঙ্গজেবের দলের কাছে হেরে গেছে।

গোলাম মওলা

মুসলমানের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হতে হিন্দুরও তেমনি যেন মজ্জাগত আপত্তি। রামমোহন আর কেশব সেনের ব্রাহ্মদল আর্য্যসমাজী আর সনাতনীদের কাছে হেরে গেছে। আর হিন্দুর ক্ষতিস্বীকারের কথাটা ধীরেনবাবু যা বললেন ও-সম্বন্ধে আমার বক্তব্যও তাঁর শোনা দরকার। কথায় বলে, পেটে খেলে পিঠে সয়। কাজেই পেটে যারা খায়নি পিঠে সওয়ার কথা তাদের বেলায় ওঠেই না।

ধীরেন্দ্রলাল

পেটে খেলে পিঠে যদি সইতেই হয় তবে সাবধান হয়ো মওলা। তা ছাড়া দীর্ঘ উপবাসের পরে পারণ করতে বসেছ—ব্যাপারটা বাস্তবিকই শঙ্কিত হবার মতো।

গোলাম মওলা

বহু ধন্যবাদ আপনার সাধু উৎকণ্ঠার জন্যে।

বশীরুদ্দিন

হিন্দু ও মুসলমান যে পরস্পরের সঙ্গে মিল্‌তে পারছে না আমার মনে হয় তার আসল কারণ তাদের পরস্পরের প্রতি মজ্জাগত বিদ্বেষ নয়, আসল কারণ তাদের ধর্ম্মের এমন সংস্কার যাঁরা করতে চেয়েছিলেন তাঁদের চেষ্টার অস্বাভাবিকতা। উদারতা ভালো কিন্তু যুগযুগান্তরাগত ধর্ম্মকে অতিক্রম করতে চায় যে-উদারতা তা মানুষের সহ্য হয় না।

আলি গওহর

আমি মওলানা সাহেবের সঙ্গে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে ধর্ম্মকে অতিক্রম করতে চায় যে-উদারতা তা মানুষের সহ্য হয় না। ধর্ম্মকে অতিক্রম করতে পারে কেবল শ্রেষ্ঠতর বা নবতর ধর্ম্ম।

গোলাম মওলা

কিন্তু এই উদার দলের প্রশংসাই ত আপনার মুখে।

আলি গওহর

আমি এঁদের উদার বলে প্রশংসা করি না শক্তিমান বলে' শ্রদ্ধা করি। উদারতা করুণার অন্য নাম, কিন্তু শক্তিমত্তা হচ্ছে জীবনের নব প্রয়োজনের উপলব্ধি। এঁদের সে উপলব্ধি আজো সমস্ত দেশের উপলব্ধি হয়ে ওঠে নি, মিথ্যা নয়, কিন্তু সে উপলব্ধি মর্য্যাদাহীন হয় নি কোনো দিন। আর একালে দেশের নবজন্মের রূপ এ যে গ্রহণ করতে পেরেছে এতেই প্রমাণিত হয়েছে এর বাঁচবার ও বাড়বার অদম্য শক্তি।

বশীরুদ্দিন

কিন্তু ধর্ম্মের ত প্রবর্ত্তক চাই—আপনার এই শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক কে ?

আলি গওহর

ইচ্ছা করলে অতীতের যে কোনো মহাপুরুষকে এর প্রবর্ত্তক বলতে পারেন। কোনো ধর্ম্মেরই ত একজন প্রবর্ত্তক নন। এমন কি যাঁকে প্রবর্ত্তক বলা হয় তাঁর প্রভাবই সেই ধর্ম্মের উপরে হয়ত সব চাইতে কম—কাল এতই পরিবর্ত্তনশীল। মানুষের সমস্ত উন্নতি-চেষ্টার মতো ধর্ম্মও কালের আঙিনায় মানুষের শক্তির খেলা। একালের শ্রেষ্ঠতর বা নবতর ধর্ম্ম যাকে বলা হচ্ছে তাও তাই—মানুষের এগিয়ে যাবার আরো খানিকটা চেষ্টা নব নব জ্ঞানের প্রেরণায়। এর আরম্ভ যে আজকে থেকে নয় সে কথা ধীরেনবাবুও এই মাত্র বলছিলেন।

বশীরুদ্দিন

ধর্ম্মকে রাজনীতি থেকে পৃথক ভাবা কি যায় না ?

আলি গওহর

অনেক রাজনীতিজ্ঞ বলতে চান—যায়। কিন্তু তাঁরা হয় সৌখীন নয় কৌশলী রাজনীতিজ্ঞ। ধর্ম্মকে বাস্তবিকই রাজনীতি থেকে পৃথক করা

যায় না। ধর্ম্ম মূলতঃ রাজনীতি—দৈনন্দিন জীবনের শক্তিমন্ত নিয়ামক। সেজন্যে নতুন রাজনীতির অর্থ নতুন ধর্ম্মজীবন, অথবা নতুন ধর্ম্মজীবনের অর্থ নতুন রাজনীতি।

সুজিৎ

হাঁ—তোমার দিক থেকে দেখলে অনেক বেশী করে চোখে পড়ে সব রকমের সাম্প্রদায়িক আপোষ-চুক্তির দুর্ব্বলতা আর নব জাতীয়তা-বোধের শক্তি। কিন্তু গওহর, তুমি ত দেখছ এদেশে মুসলমান সমস্যা দিন দিন কেমন জটিল হয়ে উঠছে। অথচ সেটি উৎকট ভিন্ন আর কিছুই হচ্ছে না—কোনো রকমের উৎকর্ষ-লাভের দিকে এর গতি নয়। একটা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সম্প্রদায়ের পক্ষে একে শোচনীয় না বলে উপায় নেই তা কারণ এর যাই হোক। যেমন করেই হোক এই বিরাট সম্প্রদায়কে জাতীয় জীবনের বৃহত্তর কর্ম্ম ও চিন্তাক্ষেত্রে হাজির করে দেওয়াই কি এখন দেশের সব চাইতে বড় সমস্যা নয়? দেশের মানসিক স্বাস্থ্য যদি কোনো এক জায়গায় দূষিত হয়ে চলে তবে তা বিপজ্জনক হয়ে ওঠে সমস্ত দেশের জন্য।

আলি গওহর

এইবার এই সমস্যার মর্ম্মস্থলে ঘা দিয়েছ সুজিৎ—এই মুসলমানের উৎকট স্বাতন্ত্র্য-বোধ। হিন্দুর স্বাতন্ত্র্য বোধও চোখে না পড়ে যায় না। হাজার বছরেও তা নষ্ট হলো না—তবু একালে মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য-বোধকেই বলতে হয় উৎকট। নিজেকে নিয়ে এর দুর্ভাবনার অন্ত নেই, চারদিকে এ কেবল দেখছে উদ্যত ঘুষি। এর কারণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আমি বলেছি। তার দুই একটা ঘুরিয়ে এই ভাবেও বলা যায়—উত্তর ভারতের মুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়েও প্রভাব প্রতিপত্তি ভোগ করে এসেছে দীর্ঘদিন, আজ গণজাগরণের সামনে তাদের নতি স্বীকারে অনিচ্ছা ধরেছে এই ভারতব্যাপী মুসলিম বিক্ষোভের রূপ, কেননা

ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে তারা কুলীন। কিন্তু কারণ যাই হোক, এই বিক্ষোভ হয়ে দাঁড়িয়েছে এক মহাসমস্যা—এ কঠিন প্রশ্নের উদ্রেক করেছে হিন্দু মুসলমান দুই দলেই। হিন্দুদলের বাস্তববাদীরা ভাবতে চাচ্ছেন—এর শেষ মীমাংসা হয়ত তলোয়ারে। মুসলমান বাস্তববাদীদের ভাবনার ধারাও তাই—তাঁরা কখনো কখনো ভাবছেন ভারতবর্ষকে হিন্দুস্থানে আর পাকস্থানে ভাগ করতে।

গোলাম মণ্ডল

বাস্তবিক ইকবালের পাকস্থানের পরিকল্পনাটি একটি ভাববার মতো বিষয়। হিন্দু-মুসলমানের এই অনেক কালের কঠিন বিরোধের রীতিমতো সম্মুখীন হবার চেষ্টা রয়েছে ওতে।

আলি গওহর

দুর্ভাগ্যক্রমে তা ঠিক নেই যদিও ইকবালের মতো প্রতিভাবানের নাম ওর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। ওর গোড়ায় রয়েছে এক বড় রকমের গলদ—যে-শক্তিবলে এমন বিভাগ বিভক্ত জনগণের জীবন-বিকাশের সহায় হতে পারে তারই অভাব ঘটেছে ওতে। এমন বিভাগ করতে চাওয়া হয়েছে প্রাচীন ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম-সম্পর্কিত সংস্কৃতির বিভিন্নতার ভিত্তিতে। কিন্তু সেইটিই যে একালে মানুষের আশ্রয়যোগ্য ভিত্তি আর নয়। তার কারণ, একালের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের সঙ্গে ঘটেছে তার বিচ্ছেদ—প্রতি যুগের যা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তার নির্দ্দেশ অমান্য করবার ক্ষমতা মানুষের নেই। এমন বিভাগ বা বিভাগের আশঙ্কা নিয়ে মারামারি তাই মন্দ না জমবার কথা, কিন্তু আমাদের একালের জীবনের পরিচালনায় এ যে অক্ষম তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। নব-অভ্যুত্থানকামী মুসলিম দেশেও প্রেরণা আসছে প্রাচীন ধর্ম্ম ও প্রাচীন সংস্কৃতি থেকে নয়—নব জ্ঞান-বিজ্ঞানের নব আশা ও নব শক্তি-সম্ভাবনা থেকে। ভারতেও পাকস্থান গড়ে তোলার দিকে মুসলমানদের

আগ্রহ লক্ষ্যযোগ্য হয়নি আজো, কেননা আসলে সেটি তাদের ভারতবর্ষ থেকে পলায়নের অন্য নাম। তাঁদের কেউ কেউ আজ পর্য্যন্ত যা চাচ্ছেন তা হচ্ছে স্বামীর সোহাগকে কেন্দ্র করে' দুই সতীনের ঝগড়া করবার মতো ব্যাপার—অর্থাৎ দেশের মূল যে প্রশ্ন স্বাধীনতা-লাভ তাইই চাপা পড়েছে তাতে।

গোলাম মণ্ডল

বৃথা তর্ক করে লাভ নেই—ব্যাপারটা তাইই। কিন্তু মহাখ্যাতি-সম্পন্ন কংগ্রেসও কি স্বাধীনতা বাস্তবিকই চাচ্ছে ?

আলি গওহর

কংগ্রেসের সবাই যদি স্বাধীনতা বাস্তবিকই চাইত তবে স্বাধীনতা পেতে একটুও দেরী হতো না। কিন্তু এতে সন্দেহ প্রকাশ করবার উপায় নেই যে সত্যকার কংগ্রেসে, অন্য কথায় দেশের মর্ম্মে, সঞ্চারিত হয়েছে এই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা—এই বেঁচে উঠবার আশা; যাদের হয় নাই তারা দুর্ভাগ্য—মৃত্যুবিষে জর্জ্জরিত। কিন্তু মৃত্যুর সমস্ত ছলনা এড়িয়ে ছুটতে হবে এই বাঁচবার পথেই। আজ যাকে আমরা পূর্ণ সত্য বলে জানি না জীবনের প্রতিকর্ম্মে তাকে অস্বীকার করে চলাই হচ্ছে সেই মৃত্যুর ছলনায় আকৃষ্ট না হবার সাধনা। যাঁরা নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে সেকালের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি আবার মানুষের সমাজে সচল করতে চান তাঁরা পড়েছেন সেই মৃত্যুর ছলনায়। তাঁরা বুঝতে চান না এই চিরন্তন সত্য যে মানুষের দেহের মতো মানুষের মত-বিশ্বাসও ধ্বংসের অধীন। মানুষ মরে যায়, রেখে যায় সন্তান সন্ততি; মানুষের মত-বিশ্বাসও তেমনি ধ্বংসের অধীন হয় জীবনের নূতন প্রয়োজনে নূতন নূতন মত-বিশ্বাসের জন্ম দিয়ে। একালের অপ্রতিহত সত্যানুসন্ধিৎসায় আর বিচিত্র কল্যাণ-মুখিতায় মানুষের এতকালের জ্ঞান ও ভাব-সাধনার ধারা খণ্ডিত হয়নি সার্থকতার সরল পথই অনুসরণ করে চলেছে—এই সত্য-দৃষ্টিকে পূর্ণ

মূল্য দিতে হবে। তা দিতে মাঝে মাঝে আমরা কুণ্ঠিত হই বলেই অল্প দিন ধরে যে জগতে বসবাস করছে সেই মুসলমানের একগুঁয়েমি আর দীর্ঘ দিন ধরে যে কিছু কিছু দুঃখবিপর্য্যয় সহ্য করেছে সেই হিন্দুর দ্বিধা আমাদের ভয় দেখাতে পারে।

বশীরুদ্দিন

কিন্তু যারা একগুঁয়ে আর যাদেব মনে দ্বিধা দেখা দিয়েছে তারা কেমন করে চলবে এই সার্থকতার সরল পথে!

আলি গওহর

এই সার্থকতার সরল পথের যে দুর্জ্জয় আকর্ষণ—সমস্ত আপত্তি তাতে যায় ঘুচে; ঘোচে না কেবল তাদের যারা চলৎ-শক্তি-রহিত—ঝর্ণার পথে যেমন শিলাখণ্ড। কিন্তু আমরা সেই চলৎ-শক্তি-রহিত শিলাখণ্ড নই—এই সংবাদ আমাদের মর্ম্মে পৌঁছেচে। আমরা পর্ব্বতগুহায় বন্দী জলরাশি—কারাপ্রাচীর ভেঙে পথ পাবার উৎকণ্ঠায় আমরা বিবর্ণ। সার্থক হোক আমাদের সেই বিপুল ও বিচিত্র উৎকণ্ঠা ভাগ্যের নির্দ্দেশিত পথে। সত্য আমাদের জন্য ধরেছে ভারতীয় জাতীয়তার সার্থক রূপ আর চাচ্ছে আমাদের পূর্ণ আত্মসমর্পণ, এ ভিন্ন আর কোনো পথ আমাদের সামনে নেই আর যা দেখা যায় সব বিপথ—আমাদের এই নবলব্ধ চেতনা আজ রূপ পেতে চাচ্ছে জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে।

ধীরেন্দ্রলাল

ভারতীয়তা একালে আমাদেব জন্য বিশেষ অর্থপূর্ণ নিঃসন্দেহ। কিন্তু আপনি কি বলতে চান চিরদিনই আমরা বাঙালী মান্দ্রাজী পাঞ্জাবী না হয়ে ভারতীয় হব বেশী?

আলি গওহর

বাঙালী মান্দ্রাজী পাঞ্জাবী না হয়ে নয় বরং বাঙালী মান্দ্রাজী পাঞ্জাবী হয়েও আমরা ভারতীয়ই হব বেশী। ভারতের ভৌগোলিক বিন্যাস

আর বহু যুগের ইতিহাস ভারতীয় জীবনের এই প্রয়োজনের মূলে। ভারতীয়তা আমাদের উদ্ধার-মন্ত্র—আমাদের রক্ষা-মন্ত্র হবার ক্ষমতাও তারই আছে।

সুজিৎ

ভারতীয়তার তুমি যে মূল্য দিচ্ছ সে সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। যে স্বাধীনতা সকল রকম শ্রীবৃদ্ধির গোড়ার কথা আমাদের দেশের জন্য তাকে পাবার আর পেলে রাখবার উপায় হচ্ছে এই ভারতীয় সংহতি। কিন্তু একটি বড় বিপদও যে এক্ষেত্রে আছে, এটি সহজেই হতে পারে বড় দলের সংহতি আর ছোট দলের দুর্গতি—জার্ম্মানী আর ইটালিতে যা হচ্ছে। সেই সঙ্কটের প্রতিকার সম্বন্ধে কি ভেবেছ?

ধীরেন্দ্রলাল

বোধ হয় কিছুই না। কারণ, এর প্রতিকার নেই। আপনার সাম্য-পতাকা-বাহী রাশিয়াও এর প্রতিকার খুঁজে পাচ্ছে না।

গোলাম মণ্ডল

তাহলে আর সংখ্যালঘিষ্ঠরা জেনে শুনে এই নতুন বিপদে মাথা দিতে যাবে কেন?

ধীরেন্দ্রলাল

যাবে এই সোজা কারণে যে তখন বিপদের সম্ভাবনা হবে এখনকার চাইতে অনেক কম—দেশের ভালমন্দের কথা তখন সহজ ভাবে ভাববার সুযোগ দেশের সবারই হবে তৃতীয় পক্ষের অভিভাবকতার অভাবে। দেশের ধন-সম্পদ মান-সম্ভ্রম সবই তখন অনেক বাড়বে, তাতে দেশের সবারই ভাগে এসব এখনকার চাইতে অনেক বেশী পড়বার সম্ভবনা হবে পনের আনা।

বশীরুদ্দিন

তাহলে আপনি বলতে চান সংখ্যাগরিষ্ঠদের প্রভুত্ব মেনে নিয়ে সংখ্যালঘিষ্ঠদের রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ করতে হবে—এ ভিন্ন গত্যন্তর নেই।

ধীরেন্দ্রলাল

হাঁ—কতকটা তাই বৈ কি। গওহর সাহেবের মতো মানুষকে দেবতা ভাবা আমার পক্ষে কঠিন।

আলি গওহর

অসম্ভব যে বলেন নি সেজন্য ধন্যবাদ। কিন্তু মানুষকে অসুর ভাবাও আপনার পক্ষে তুল্যরূপে কঠিন। শিক্ষিতদের একটা বড় পরিচয়-লক্ষণ এই যে ভগবানের সৃষ্টিকে কেটে ছেঁটে নিজের মনে সাজিয়ে দেখতে তাঁরা ভাল বাসেন।

ধীরেন্দ্রলাল

অর্থাৎ শিক্ষিতেরা আপনার চোখে একদল সৌখীন ভাবুক। কিন্তু সে-দলে ভিন্ন আপনারই বা স্থান কোথায়?

আলি গওহর

আমি নিজেকে জানি প্রেমিক বলে'—ভগবানের সৃষ্টির আমি প্রেমিক। এর বিকাশের রূপ আর ধ্বংসের রূপ দুইই পরম অর্থপূর্ণ আমার চোখে।

ধীরেন্দ্রলাল

আমি বলবো, বিকাশ আর ধ্বংসের মধ্যে বিকাশের রূপকে আপনি বেছে নিয়েছেন আর সাজিয়ে-গুজিয়ে দেখছেন।

আলি গওহর

ঠিক সাজিয়ে-গুজিয়ে দেখছি না। আমি সৃষ্টির প্রেমিক, আবার সৃষ্টির অংশও। সৃষ্টিতে জল আছে তা গড়িয়ে গড়িয়ে যায়, আর আগুন

আছে তা আকাশে হাত বাড়ায়। আমি বুঝি, জল আর আগুনের খেলা দেখবার অবসর আমার জন্য প্রায় নেই—আমাকে হয় জল হতে হবে নয় আগুন হতে হবে। এই হবার তাগিদ আমাদের শিক্ষিতদের মনে খেলে কম। তাই চিন্তা তাঁদের এত অস্বস্তি দেয়। কিন্তু মওলানা সাহেবের প্রশ্নটা চাপা পড়ে যাচ্ছে। স্বাধীন দেশে বড় দল ছোট দলের উপরে অত্যাচার করেই ধীরেনবাবুর এই মত মানা যায় না। তাহলে স্বাধীনতা একটা অর্থশূন্য ব্যাপার হতো। পৃথিবীর বর্ত্তমান যুগ এক বিশেষ ভাঙা-গড়ার যুগ। এ যুগের অনেক ব্যাপার শুধু এ যুগেরই।

ধীরেন্দ্রলাল

রাশিয়ার বিজয়ীদল তাদের বিরুদ্ধবাদীদের ক্রমাগত ফাঁসি দিচ্ছে। জার্ম্মানী ইটালিতেও সেই ব্যাপার চলেছে—আপনি বলতে চান এসব শুধু একালের ব্যাপার?

আলি গওহর

হাঁ তাই। আগেকার দিনের চেঙ্গিস তৈমুরের সঙ্গে একালের ষ্টালিন হিট্‌লারের প্রধান তফাৎ এই যে দেশের লোকদের মনোভাবের দিকে সব সময়ে তাঁদের রীতিমতো তাকাতে হচ্ছে—চেঙ্গিস তৈমুরের সে-মাথাব্যথা ছিল না। রাশিয়া, জার্ম্মানী, ইটালি, সব দেশেই চলেছে পতন-দশা থেকে গা ঝাড়া দিয়ে উঠবার প্রবল চেষ্টা, বিঘ্ন বিপত্তি তাদের চারদিক ঘিরে—কিছু বাড়াবাড়ি হয়েছে এই বিশেষ অবস্থার আনুষঙ্গিক।

গোলাম মওলা

আমি দেখছি একালের ডিক্‌টেটরদল সেকালের চেঙ্গিস-তৈমুরেরই দ্বিতীয় সংস্করণ। সেকালের চেঙ্গিস-তৈমুররা সৈন্য সংগ্রহ ক'রে দেশে দেশে লুট-তরাজ ক'রে ফিরতো। একালের ডিক্‌টেটররা দেশের জন-সাধারণকে দুই চারটা মধুর কথায় ভুলিয়ে করে তুলেছে লুটেরা দুর্ব্বল প্রতিবেশীদের

সর্ব্বস্বান্ত করবার জন্যে। দেশের ভিতরকার যারা তাদের লুটে যোগ দিচ্ছে না তাদের তারা করছে পথের ফকির।

আলি গওহর

দেশের জনসাধারণকে যে ভোলাতে হচ্ছে এতেই রয়েছে একালের বিশিষ্টতা। এ জন-জাগরণের কাল। এখনো যারা জাগেনি তাদের উপরে চলেছে যারা জেগেছে তাদের উপদ্রব। কিন্তু জন-নায়কদের যতই লোভ হোক সাম্রাজ্য-স্থাপন একালে হচ্ছে না—সাম্রাজ্যের মহিমা একালে ঘুচে গেছে, বিজিতের কণ্ঠে তার জয়-ঘোষণা আর হবে না। এসব উপদ্রব শুধু ছড়িয়ে দেবে জন-জাগরণ। জার্ম্মানীতে ইহুদি-দলন কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র ব্যাপার।

সুজিৎ

কিছুটা যে স্বতন্ত্র তাতে সন্দেহ নেই। ইহুদিরা যে ইহুদি সে কথা তারাও জানতো, আর-সকলেও জানতো। প্রধানতঃ এম্‌নি একটা স্বতন্ত্র শ্রেণী থেকেই তারা সম্পন্ন হতে চেয়েছিল। গত মহাযুদ্ধে তাদের রক্ত-দান নাকি যথেষ্ট হয়নি। কিন্তু অনেকের মতে ইয়োরোপীয় জন-সাধারণের যে মজ্জাগত ইহুদি-বিদ্বেষ তাই কাজে লাগাবার চেষ্টা হয়েছে হিট্‌লারের দলের।

আলি গওহর

ইহুদিরা লঘু পাপে গুরুদণ্ড ভোগ করেছে কি না তার বিচারক কাল —অত্যাচারীকে কাল কখনো ক্ষমা করে না। কিন্তু তাদের মতো স্বাতন্ত্র্য-বোধ মানুষের ইতিহাসে যে অপরাধ একথা বলতে হবে। মাটিতে যে গাছ হয় তার বৃদ্ধি, বংশবৃদ্ধি, বিনাশ, সব স্বাভাবিক, কিন্তু টবে-জিয়ানো অক্ষয়-বট স্বভাব-বিরোধী তা হোক না তার বাঁচবার শক্তি যত অদ্ভুত। বিকাশ-ধর্ম্মী জীবনের আশ্রয় যে ভূমি-শক্তি আর রাজশক্তি তা থেকে বঞ্চিত হয়ে বহু পূর্ব্বেই ইহুদিদের নিশ্চিহ্ন হওয়া

উচিত ছিল। গ্রীক রোমান মরে' গেছে—তাতে জগতের ক্ষতি হয়নি। ভারতেও এসে জুটেছে এম্‌নি বহু অক্ষয়-বট। দেশের মাটিতে শিকড় গেড়ে তারা বট হবার সৌভাগ্য লাভ করুক, তাদের "অক্ষয়"ত্বের অভিশাপ ঘুচুক—এই দেশের কর্ম্মীদের সব চাইতে বেশী করে' দেখবার। এ ব্যাপারে হুশিয়ার না হলে আমরা ভাগ্যের নির্দ্দেশের বিরোধী হব, তার প্রসন্ন মুখ দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হবে না—এই কথাই তোমাকে বলতে চেয়েছি সুজিৎ।

সুজিৎ

হাঁ এই কথাই তুমি বলতে চেয়েছ। আমারও একথা শুনবার প্রয়োজন ছিল। দেখছি আমার সচেতন জীবনের সূচনায় আমাকে আকর্ষণ করেছিল যে দেশের গণ-জীবন সেটি আমার ভাগ্য-বিধাতার আশীর্ব্বাদ।

আলি গওহর

নিশ্চয়। আর আমাদের সবারই পরম সৌভাগ্য এই যে দেশ আবিষ্কার করতে পেরেছে যে তার কর্ম্ম-প্রবাহের উৎস হচ্ছে গণ-সেবা। এইই দেশের গৌরব-সংবাদ—দেশ যে মৃতের দেশে পরিণত হয়নি তার প্রমাণ এই গণ-চেতনা। রাজা-মহারাজা যা দেখছ, ভদ্রলোক শাস্ত্রী মওলানা যা দেখছ, সব ক্ষেতের আলে আলে পোঁতা চুণ-কালির দাগ-পরা বিভীষিকা মাত্র। শ্রেণী-সংগ্রাম এদেশে তাই জম্‌বে না—তথা-কথিত উচ্চশ্রেণী হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে এত সহজে। কিন্তু সেই-জন্যেই এই জাগরণের দায়িত্ব অনেক বেশী। যাকে বলা হয় গোড়া থেকে জীবনের পত্তন সেই কাজ দেশের সাম্‌নে। দেশের রাজনৈতিক অগ্রগতির পথে অহিংসাকে যে পাথেয় রূপ গ্রহণ করা হয়েছে এও দেশের মহাভাগ্য কেননা অহিংসার অন্য নাম অমত্ততা অর্থাৎ অতন্দ্রিত জ্ঞান ও কর্ম্ম-চেষ্টা। দেশের এতকালের যে সাম্প্রদায়িক জীবন তা একটি দীর্ঘ

দুঃস্বপ্ন। যাকে বলা হয় দেশব্যাপী সঙ্ঘবদ্ধ জীবন তা যে কত বড় সত্য-জীবন তা এদেশ জানে না যুগ-যুগান্তর ধরে'। চলুক সেই সঙ্ঘবদ্ধ ভারত-জীবনের উৎসব। যুগে যুগে গণের চিরসরস চিত্তই ত লালন-ক্ষেত্র হয়েছে নব নব সত্যের। গণের সবল হস্ত ভিন্ন সত্যের পতাকা বহন করবার শক্তি আর কার আছে। হিন্দু মুসলমান শিখ খৃষ্টান এই সব বিকলাঙ্গ ও অবিকশিতমস্তিষ্কদের কথা না ভুলে উপায় নেই। ধর্ম্মবর্ণনির্ব্বিশেষে দেশের চিরনবীন গণ হতে চলেছে চিরশ্রদ্ধেয় ভারতবাসী।